Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাজিয়া আফরিন শিফা

রোলঃ 227020522

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাজিয়া আফরিন শিফা

রোলঃ 227020522

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাজিয়া আফরিন শিফা, আইডিঃ 227020522 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: মুজিবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

সাজিয়া আফরিন শিফা

(স্বাক্ষর)

সাজিয়া আফরিন শিফা

আইডিঃ 227020522

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

শয়তানের নাম ও তার পরিচয়..6

শয়তানের পরিচয়..7

শয়তানের অপকৌশলের সূচনা 9

মানুষের দেহে শয়তানের অবস্থান ও তার সঞ্চালন পদ্ধতি 12

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার পদ্ধতি সমূহ.. 14

শয়তানের অস্ত্রসমূহ.. 18

ঈমানের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা 20

নামাজ আদায়কারীকে জামাতের ব্যাপারে শয়তানের ধোকা.................................... 22

সুন্নত ও বিতর নামাজ আদায়ের শয়তানের ধোকা 23

কেরাত-সংশ্লিষ্ট ধোঁকা 25

কিয়ামুল লাইল- কেন্দ্রিক শয়তানের ধোঁকা.. 27

নামাজে পরিধেয় পোশাকের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা 28

রোজা-সংক্রান্ত শয়তানের ধোঁকা 31

হজ ও উমরা-সংক্রান্ত ধোঁকা.. 33

যাকাত-সংক্রান্ত শয়তানের ধোঁকা.. 36

উলামায়ে কেরামকে শয়তানের ধোঁকা: 39

ক. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আলেমদের সতর্কতা.................................... 41

খ. কোনো প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং করার ক্ষেত্রে সতর্কতা 42

গ.হাসি-ঠাট্টায় সতর্কতা অবলম্বন করা 42

ঘ. দরিদ্রতার ধোঁকা.. 43

ঙ.বিতর্ক-কেন্দ্রিক শয়তানের ধোঁকা 45

ফতোয়া প্রদানকারীদের কে শয়তানের ধোঁকা.. 47

মুহতামীম সাহেবদের কে শয়তানের ধোকা.. 49

মাদ্রাসার উস্তাদদের শয়তানের ধোঁকা.......... 50
ওয়ায়েজ ও বক্তাদের প্রতি শয়তানের ধোঁকা 54
লেখক-কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি শয়তানের ধোকা 56
প্রকাশকদের শয়তানের ধোঁকা 59
পাঠকদের শয়তানের ধোকা 60
সাধারণ লোকদের শয়তানের ধোঁকা.......... 63
মা-বাবাকে শয়তানের ধোঁকা.......... 69
স্বামী -স্ত্রীকে শয়তানের ধোকা 75
ক. নবদম্পতিদের শয়তানের ধোঁকা.......... 77
খ. জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান.......... 77
প্রস্রাব পায়খানার ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা.......... 83
অযুর ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা 84
আযানের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা 85
উপসংহার 85
প্রাসঙ্গিক উৎস.......... 86

ভূমিকা

শয়তান এবং মানুষের মধ্যে শত্রুতা প্রাচীন, কারণ এটি নিশ্চিত করে বলা যায়, শয়তান মানুষের অস্তিত্বের শুরু থেকেই মানবজাতির প্রতিপক্ষ। বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে তার শত্রুকে ভালভাবে বোঝে, তাকে চিনতে পারে এবং জানতে পারে

তার প্রতিপক্ষের পরিকল্পনা ও কৌশল। সুতরাং, শয়তানকে বোঝার জন্য, আমাদের অবশ্যই শয়তান এবং আমাদের সম্পর্কে তার পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যগুলিকে স্বেচ্ছায় চিনতে হবে। একই সাথে গুরুত্বপূর্ণ এটা জানা যে, শয়তানের ষড়যন্ত্রের ফাঁদ থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় এবং সরল সোজা পথে হেঁটে বেহেশতে পৌঁছানো যায়। এই পথ অবশ্য সহজ নয় কেননা মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের পদ্ধতির কোন অভাব নেই। আল্লাহর সাথে শিরক করা,মিথ্যাকে সত্য হিসেবে এবং সত্যকে মিথ্যা হিসেবে উপস্থাপন করা, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া,উপদেশ দানকারী ও কল্যাণকামী সেজে মানুষের সামনে উপস্থিত হওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে শয়তান মানুষকে ধীরে ধীরে পাপের পথে নিয়ে যায়। আর এই পদ্ধতি গুলোর মূল অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে মদ বা নেশা দ্রব্য, গান বাজনা, বাদ্যযন্ত্র, টেলিভিশন, সিনেমা, নাচ, জাদু-টোনা,গণক, জ্যোতিষী ইত্যাদিকে। শয়তানের করানো গতানুগতিক গুনাহ গুলো তো মানুষ ধরতে পারে সহজেই।কিন্তু যে সব গুনাহ ভালো কাজের আড়ালে থাকে,সেগুলো সাধারণত চোখে পড়ে নাহ। কারণ শয়তান খুব সূক্ষ্মভাবে ভালো কাজের মোড়কে সেই গুনাহ গুলো মানুষকে দিয়ে করায়। মূলত, এই গবেষণায় যে সব গুনাহের কাজ ভালো মনে করে করা হয় সেগুলোই তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

শয়তানের নাম ও তার পরিচয়

শুরুতে শয়তান আল্লাহর ইবাদত করত। সে আকাশে ফেরেশতাদের সাথে থাকতো এবং জান্নাতে অবস্থান করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা যখন আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করে সেজদা করার আদেশ দিল, শয়তান তখন আল্লাহর আদেশ অমান্য করলো। অহংকার করে আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা করা থেকে বিরত রইল। ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন।

আরবি ভাষায় শয়তান(الشيطان) বলা হয় প্রত্যেক অবাধ্য, উদ্ধত এবং সীমালংঘনকারীকে। আরবি الشيطان শব্দটি,شطن শব্দ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। شطن অর্থ যে হক থেকে দূরে সরে গিয়েছে বা সে অবাধ্য হয়েছে। আর শয়তানকে শয়তান বলে নামকরণের কারণ হলো সে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে এবং তার আদেশের সামনে ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছে। শয়তানের

অন্য আরেকটি নাম হলো তাগুত(الطاغوت)। তাগুত শব্দের অর্থও হলো অবাধ্য উদ্ধত এবং সীমালংঘনকারী। সুতরাং শয়তানি হলো বড় তাগুত[১]। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَاۤءَ الشَّيْطٰنِ ۚ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا

যারা ঈমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরী করেছে তারা লড়াই করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা লড়াই কর শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল। (সুরা নিসা,৭৬)

শয়তানের পরিচয়

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আলেমগণ শয়তানের পরিচয় নিয়ে মতানৈক্য করেছেন। তাদের কেউ বলেছেন শয়তানের মূল হচ্ছে ফেরেশতাদের থেকে। আবার কেউ বলেছেন শয়তানের মূল হচ্ছে জ্বীনদের থেকে। দ্বিতীয় মতটিই মজবুত প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাধান্য প্রাপ্ত মত।সরাসরি কুরআনে এসেছে যে, সে জিনদের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰۤىِٕكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْٓا اِلَّآ اِبْلِيْسَؕ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهٖ

যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, আদমকে সেজদা করো তখন সবাই সেজদা করল ইবলিশ ব্যতীত। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালনকর্তার আদেশ অমান্য করলো।(সূরা কাহাফ,৫০)

এবং এ আয়াতেরই শেষাংশে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

اَفَتَتَّخِذُوْنَهٗ وَذُرِّيَّتَهٗٓ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِيْ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۗ بِئْسَ لِلظّٰلِمِيْنَ بَدَلًا

অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধর কে বন্ধু রূপে গ্রহণ করেছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু। এটা জালেমদের জন্য খুবই নিকৃষ্ট বদল। (সূরা কাহাফ, ৫০)

এ আয়াতে প্রথমাংশে তো একেবারেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে শয়তান জিনদের থেকে। সে ছিল জিনদের একজন। আর দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছে যে তার বংশধর থাকবে। আর এটা তো স্পষ্ট কথাই যে ফেরেশতাদের কোন বংশ পরম্পরা নেই, সন্তান -সন্ততি নেই। অন্যদিকে জিন জাতি সন্তান জন্ম দেয়ার মাধ্যমে বংশবিস্তার করে।

আবার কোরআন ও হাদিস থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, জিনরা ভিন্ন একটি জাতি। তারা ফেরেশতা বা মানুষদের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এসেছে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন,

خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

ফেরেশতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে। জিন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়াবিহীন আগুনের শিখা থেকে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের নিকট বর্ণিত বস্তু থেকে (মাটি থেকে)। (মুসলিম, ৭২২৫)

পবিত্র কোরআনে এসেছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسۡجُدَ اِذۡ اَمَرۡتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَیۡرٌ مِّنۡهُ ۚ خَلَقۡتَنِیۡ مِنۡ نَّارٍ وَّخَلَقۡتَهٗ مِنۡ طِیۡنٍ

সে (ইবলিশ)বলল, আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটির দ্বারা। (সূরা আরাফ,১২)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالۡجَآنَّ خَلَقۡنٰهُ مِنۡ قَبۡلُ مِنۡ نَّارِ السَّمُوۡمِ

আর জিন কে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে।

وَخَلَقَ الۡجَآنَّ مِنۡ مَّارِجٍ مِّنۡ نَّارٍ

আল্লাহতায়ালা বলেন, আর জিন কে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন আগুন হতে।

শয়তানের অপকৌশলের সূচনা

শয়তানের অপকৌশলের সূচনা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এর সৃষ্টির সময় থেকেই ঘটে। কুরআনে এবং হাদিসে উল্লেখিত হয়েছে যে, শয়তান মানুষের প্রতি শত্রুতা এবং প্রতারণার মাধ্যমে তাদের সৎপথ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে আসছে। ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমে বিস্তারিত বিবরণ আলোচনা করা যাক:

১. আদম (আ.) এর প্রতি শয়তানের হিংসা বা শয়তানের অহংকার :

আল্লাহ আদম (আ.) কে সৃষ্টি করার পর ফেরেশতাদের আদেশ দেন তাকে সিজদা করতে। সবাই সিজদা করলেও ইবলিস (শয়তান) তা অস্বীকার করে এবং আল্লাহর অবাধ্য হয়। আল্লাহ বলেন:

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ؕ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۚ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ

তিনি বললেন, 'কিসে তোমাকে বাধা দিয়েছে যে, সিজদা করছ না, যখন আমি তোমাকে নির্দেশ দিয়েছি'? সে বলল, 'আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে'। (সুরা আরাফ,১২)

এই আয়াতে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা না করার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো অহংকার। অহংকার ও আত্মগর্বের কারণে ইবলিস আল্লাহর আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এর ফলাফল সম্পর্কে আল্লাহতালা পরের আয়াতে বলেন,

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ

তিনি বললেন, 'সুতরাং তুমি এখান থেকে নেমে যাও। তোমার এ অধিকার নেই যে, এখানে তুমি অহঙ্কার করবে। সুতরাং বের হও। নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত'। (সুরা আরাফ,১৩)

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে এটা স্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, আল্লাহ তায়ালার সাথে প্রথমে যে গুনাহ সম্পাদন করা হয়েছে তা হলো অহংকার। আর প্রথম অহংকারী বা অবাধ্যতাকারী হল ইবলিশ শয়তান। এই অহংকারের কারণেই শয়তান আল্লাহর লানতপ্রাপ্ত হয়েছে চিরকালের জন্য।

২. জান্নাতে প্রতারণা

ইবলিসকে জান্নাত থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং সে প্রতিজ্ঞা করে যে, সে আদম (আ.) এবং তার সন্তানদের সৎপথ থেকে বিচ্যুত করবে। সে আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) কে ধোঁকা দিয়ে জান্নাত থেকে বের করার চেষ্টা করলো।আল্লাহ তায়ালা আদম আলাইহিস সালামকে আদেশ দিয়ে বললেন,

وَيٰٓاٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَـنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

'হে আদম! তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে বসবাস কর এবং এখানে তোমাদের মনে যা চায় তাই খাও, কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; তাহলে তোমরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (সুরা আরাফ, ১৯)

সুতরাং যারাই আল্লাহর আদেশ মানবে না, তার আনুগত্য করবে না, তারা জালেম। এরপর শয়তান তাদেরকে ওয়াসওয়াসা দিল,

فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطٰنُ لِيُبْدِىَ لَهُمَا مَا وٗرِىَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْاٰتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّاۤ اَنْ تَكُوْنَا مَلَـكَيْنِ اَوْ تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِيْنَ

অতঃপর তাহাদের লজ্জাস্থান, যাহা তাহাদের নিকট গোপন রাখা হইয়াছিল তাহা তাহাদের কাছে প্রকাশ করিবার জন্য শয়তান তাহাদেরকে কুমন্ত্রণা দিল এবং বলিল, 'পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশ্‌তা হইয়া যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী হও এইজন্যই তোমাদের প্রতিপালক এই বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করিয়াছেন।'
(সুরা আরাফ, ২০)

অর্থাৎ শয়তান তাদেরকে প্রতারণার মাধ্যমে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে প্ররোচিত করে। ফলে তারা আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করেন এবং জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নেমে আসতে বাধ্য হন।

শয়তান মানুষের শালীন পোশাক খুলে ফেলতে চায়, যাতে করে মানুষের মধ্যে নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা আর অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে। আর এটাই হল মানুষকে পথভ্রষ্ট করার সবচেয়ে

সহজ পন্থা। অর্থাৎ মানুষের মাঝে যত বেশি অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়বে তারা তত বেশি আল্লাহর দ্বীন থেকে দূরে সরে যাবে।

৩. শয়তানের প্রতিজ্ঞা

ইবলিশ শয়তান আল্লাহ তাআলার নিকট কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকার সুযোগ চাইলে আল্লাহ তাআলা তাকে এই সুযোগ দেন। সম্মান করে নয় বরং ইবলিসকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে আল্লাহতায়ালা এটা দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قَالَ اِنَّكَ مِنَ الۡمُنۡظَرِيۡنَ

আল্লাহ বলেন, তোকে সময় দেয়া হলো।
(সুরা আরাফ, ১৫)

এর পরের আয়াতে ইবলিশ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করছে। ইরশাদ হয়েছে,

قَالَ فَبِمَاۤ اَغۡوَيۡتَنِىۡ لَاَقۡعُدَنَّ لَهُمۡ صِرَاطَكَ الۡمُسۡتَقِيۡمَۙ
ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمۡ مِّنۡۢ بَيۡنِ اَيۡدِيۡهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفِهِمۡ وَعَنۡ اَيۡمَانِهِمۡ وَعَنۡ شَمَآٮِٕلِهِمۡ‌ؕ وَلَا تَجِدُ اَكۡثَرَهُمۡ شٰكِرِيۡنَ

সে বলল, আপনি আমাকে যেমন উদ্ভ্রান্ত করেছেন আমিও অবশ্য তাদের জন্য আপনার সরল পথে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসবো তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। (সুরা আরাফ, ১৬-১৭)

শয়তান তার অঙ্গীকার পালনে শতভাগ বিশ্বস্ত।সে আমাদের সামনে,পেছনে এবং ডানে ও বামে সব দিক থেকেই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে। যখন যেদিক থেকেই তার সামনে সুযোগ আসে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার, সাথে সাথে সে তা গ্রহণ করে এবং মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।

৪. মানুষকে বিভ্রান্ত করার কৌশল

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের পদ্ধতি হলো এটা যে, সে পথভ্রষ্ট করতে জোরজবরদস্তি করে না, মানুষকে প্রহার করে না বা অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাদেরকে বিপথে নিয়ে যায় না, বরং সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য ওয়াসওয়াসা বা কুমন্ত্রণা দেয়। নানা কৌশলে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে, পাপকে আকর্ষণীয় করে তোলে এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরানোর চেষ্টা করে। তার কৌশলগুলো হলো:

- পাপকে সুন্দর ও লোভনীয় করে তোলা।
- মানুষের মনে অহংকার, হিংসা ও লোভ জাগিয়ে তোলা।
- আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি করা।
- ভালো কাজ থেকে বিরত রাখা এবং খারাপ কাজে উৎসাহিত করা।

মানুষের দেহে শয়তানের অবস্থান ও তার সঞ্চালন পদ্ধতি

প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে একটি করে শয়তান রয়েছে।ইবনে কুসাইত বলেন, ওরোয়া ইবনে যুবাইর হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে
বর্ণনা করেন, এক রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছ থেকে উঠে বাইরে চলে গেলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, এতে আমার মনে ঈর্ষা জাগল। (অর্থাৎ আমাকে ছেড়ে অন্য কোন স্ত্রীর কাছে চলে গেলেন।)
অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এসে আমাকে চিন্তাযুক্ত দেখে বললেন, আয়েশা! তুমি ঈর্ষান্বিত হয়েছ? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার মত সত্তার ব্যাপারে আমার মত মহিলার ঈর্ষা হবে না।
কেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওহে আয়েশা! তোমার
উপর শয়তান প্রভাব ফেলেছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাথেও
কি শয়তান রয়েছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথেই শয়তান রয়েছে। তারপর আরজ করলাম, আপনার সাথেও কি রয়েছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমার সাথেও রয়েছে। তবে আমার সাথে যে শয়তান
রয়েছে আল্লাহ তায়ালা আমাকে তার উপর প্রভাবশালী করে রেখেছেন । এতএব
সে আমার অনুগত হয়ে গেছে, আমি তার ফেতনা ও অপকার থেকে মুক্ত থাকি । (মুসলিম) এ বিষয় সম্পর্কিত আরো হাদীছ বর্ণিত হয়েছে ।

শয়তান মানুষের মাঝে রক্তের ন্যায় সঞ্চলন করে

উম্মুল মুমেনীন হযরত সাফিয়্যা (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে এতেকাফ রত ছিলেন। আমি রাত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে গেলাম। কথোপকথন

শেষে যখন ঘরের দিকে ফিরছিলাম তখন এগিয়ে দেয়ার জন্য কিছু দূর আমার সঙ্গে এলেন। হযরত সাফিয়্যা (রাঃ)-এর ঘর ছিল উসামা বিন যায়েদ

(রাঃ)-এর ঘরের নিকটে। ইতিমধ্যে, দুজন আনসারী সম্মুখীন হলেন। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে তারা খুব দ্রুত যেতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন, থাম। আমার সাথে এ হচ্ছে সাফিয়্যা। তারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি বলেন!

(আমরা কি আপনার প্রতি কোন খারাপ ধারণা করব?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, শয়তান মানুষের দেহে রক্তের ন্যায় সঞ্চালন করে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, না জানি শয়তান তোমাদের কোন খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেয়। অথবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন, অন্য কোন কথা যেন সৃষ্টি না করে দেয়।

(বোখারী, মুসলিম)

আবু সুলাইমান খাত্তাবি(রহ.) বলেন উল্লেখিত হাদিস থেকে এ বিষয়ে উদঘাটিত হচ্ছে যে, যা দ্বারা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয় এমন বিষয় থাকে মানুষের বেঁচে থাকা মুস্তাহাব । আর সাফাই বর্ণনা করে মানুষের অযথা তিরস্কার থেকে বাঁচার চেষ্টা করা জরুরী। [২]

ইমাম শাফি (রহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা বোধ করলেন যে, আনসারদ্বয়ের অন্তরে হয়তো কোন কুধারণার সৃষ্টি হবে যার ফলে তারা কাফের হয়ে যাবেন তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম তাদের স্বার্থে কথা বলে দেন। [২]

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার পদ্ধতি সমূহ

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান নানাবিধ পদ্ধতি অবলম্বন করে। সে প্রতিজ্ঞা করেছে, মানুষকে কেয়ামত পর্যন্ত পথভ্রষ্ট করতেই থাকবে। শয়তানের প্রথম টার্গেট হলো মানুষকে পথভ্রষ্ট করে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত করা। যেন সে আল্লাহতালার রোধের সম্মুখীন হয়ে ধ্বংসে পতিত হয়।শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ে তাদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে যায়। যেমন সে নুহ আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়কে পথভ্রষ্ট করে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত করেছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে প্লাবনের মাধ্যমে ডুবিয়ে দিয়ে ধ্বংস করেছেন। অনুরূপভাবে আদ ও সামুদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছেন, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়কে সাগরে
ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন, লুত আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের ওপর আকাশ থেকে পাথরবৃষ্টি বর্ষণ করে তাদেরকে ধ্বংস করেছেন ।

ثُمَّ لَا تِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِين.َ

এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে । আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।(সুরা আরাফ, ১৭)

এই আয়াতের তাফসিরে মুফাসসিরগণ বলেছেন, শয়তান মানুষের সামনে দুনিয়ার আকৃতিতে এসে দুনিয়াকে সুন্দর ও চাকচিক্যময় করে তুলে ধরে।

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের অভিজ্ঞতার তালিকা অনেক দীর্ঘ। তবে
শয়তানের সবচেয়ে বড় ফাঁদের একটি হলো, সে মানুষের সামনে মিথ্যাকে সত্য হিসেবে এবং সত্যকে মিথ্যা হিসেবে উপস্থাপন করে। যেমন সে আদম আলাইহিস সালামের সামনে মিথ্যাকে সত্য হিসেবে পেশ করেছিল । ইরশাদ হয়েছে,

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى.

কিন্তু শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিলো। সে বলল, হে আদম! আমি কি তোমাকে জানিয়ে দেবো চিরস্থায়ী জীবনদায়ী গাছের কথা আর এমন
রাজ্যের কথা যা কোনোদিন ক্ষয় হবে না? (সুরা তাহা, ১২০)

অনুরূপভাবে শয়তান আল্লাহ তাআলাকে চ্যালেঞ্জ করে বলল,

لَأُ زَيَنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.

আমি তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেবো । (সুরা হিজর,৩৯)

অন্য আরেক আয়াতে এসেছে,

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا.

সে তাদেরকে আশ্বাস দেয়, মিথ্যা প্রলোভন দেয়, বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে আশ্বাস দেয় তা ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয় ।(সুরা নিসা,১২০)

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের আরেকটি পদ্ধতি হলো, সে গুনাহ ও হারাম বস্তুকে মানুষের সামনে ভিন্ন নামে উপস্থাপন করে। প্রতারণা ও ধোঁকাবাজির যুগে মূল বিষয়টিই উল্টে যাবে। মানুষ বস্তুকে তার ভিন্ন নামে ডাকবে। হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলোকে একেবারে হালকা ও সাধারণ মনে করা হবে। হালাল কে হারাম আর হারামকে হালাল মনে করা হবে। বর্তমানে আমরা ঠিক সেই সময়টাতেই প্রবেশ করেছি। আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি যে, বর্তমানে কীভাবে খারাপ ও নোংরা বিষয়কে ভালো ও উত্তম হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। আর ভালোকে খারাপ বলা হচ্ছে। যেমন হারাম গানবাজনা আর অশ্লীল নৃত্যকে সাধারণ বিনোদন মনে করা হচ্ছে, জিনা-ব্যভিচারের নাম দিয়েছে শারীরিক সম্পর্ক। এনার্জি বা এ জাতীয় অন্য নামে মানুষ মদ খাচ্ছে কোনো চিন্তাফিকির ছাড়াই। সুদকে ইন্টারেস্ট বা
আরও আকর্ষণীয় কোনো নামে ডাকা হচ্ছে অথচ সুদ হলো আল্লাহ তাআলার সাথে যুদ্ধ । মানুষের এমন কাণ্ড দেখে স্বয়ং শয়তানও লজ্জায় মুখ
লুকায়।

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের আরেকটি পদ্ধতি হলো, মানুষের নিকট অলসতা এবং অবসাদগ্রস্ততাকে প্রিয় করে তোলা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

তারা যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যভরে দাঁড়ায়, লোক-দেখানোর জন্য, তারা আল্লাহকে সামান্যই স্মরণ করে ।(সূরা নিসা,১৪২)

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের আরেকটি পদ্ধতি হলো, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ ، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا.

শয়তান তাদেরকে আশ্বাস দেয় এবং মিথ্যা প্রলোভন দেয়, বস্তুত শয়তান তাদেরকে যে আশ্বাস দেয় তা ছলনা ও প্রতারণা ছাড়া আর
কিছুই নয় ।(সূরা নিসা, ১২০)

অনেক যুবক আছে যারা তাওবা করতে চায়, কিন্তু শয়তান বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি এবং আশ্বাসের মাধ্যমে তাদেরকে তাওবা করা থেকে বিলম্ব করায়। অনেক বয়স্ক মানুষ আছে যারা তাওবা করতে চায়, হকের পথে থেকে আল্লাহর
ইবাদত করে তাদের বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু শয়তান তাদেরকে মিথ্যা আশা দেখিয়ে তাওবা করা থেকে দেরি করায়। শয়তান
তাদেরকে আশ্বাস দেয় এই বলে যে, অচিরেই করব, কিছুকাল পরেই করব, হয়তো কিছুদিন পর এমনি এমনিই ভালো হয়ে যাব, যদি এমনটি করতাম তাহলে এমনটি হতো ইত্যাদি ইত্যাদি।

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের আরেকটি পদ্ধতি হলো, সে উপদেশ দানকারী ও কল্যাণকামী সেজে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়। অথচ সে মিথ্যাবাদী এবং মানুষের জন্য ধ্বংস কামনাকারী । তার এই প্রতারণা শুরু
হয়েছিল আদম আলাইহিস সালামের সামনে মিথ্যা কসম করে তাঁর কল্যাণকামী সেজে ।

وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِين.َ

সে তাদের সামনে কসম করে বলল যে, আমি তোমাদের কল্যাণকামী ।(সূরা আরাফ, ২১)

অবশ্যই সে মিথ্যা বলেছিল। মিথ্যাবাদী হওয়া সত্ত্বেও সে কসম করেই বলেছিল যে, সে তার কল্যাণকামী । অথচ এর কিছুকাল পরেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, সে আদম আলাইহিস সালামের জন্য কল্যাণকামী ছিল না,
বরং সে তার জন্য ধ্বংস কামনাকারী ছিল।

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের আরেকটি পদ্ধতি হলো, সে মানুষকে ধীরে ধীরে পাপের পথে নিয়ে যায় । আস্তে আস্তে তাদেরকে গুনাহের কাজে অভ্যস্ত করে। যেমন প্রথমে দৃষ্টিবিনিময়, তারপর মুচকি হাসি, তারপর
কথা বলা, তারপর অশ্লীলতা। সে মানুষের ঘরে টেলিভিশন প্রবেশ করায় সংবাদ জানা এবং দেশ-বিদেশের খবর রাখার নামে। এরপর ধীরে ধীরে তাকে অশ্লীল ও নোংরা জিনিসে অভ্যস্ত করে তোলে। প্রথমে খবর, তারপর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, এরপর কিছুটা শালীন নাটক-সিনেমা, এরপর নাচ-গান, এরপর অশ্লীল মুভি, এরপর...। এরপর ঘর ও পরিবারের লোকদের পরস্পরের প্রতি যে সাধারণ একটা শ্রদ্ধা ও লজ্জাবোধ ছিল সেটা শেষ হয়ে
যায়। নাউজুবিল্লাহ! এই টিভির কারণে তো কোনো কোনো ঘরে জিনা- ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে।

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের আরেকটি পদ্ধতি হলো, শয়তান আল্লাহর পথের পথিকদেরকে তার বন্ধু-দোসরদের ভয় দেখায় । যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

সে তো শয়তান। সে তোমাদেরকে তার বন্ধুদের ভয় দেখায়। তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হও ।(সুরা আলে-ইমরান, ১৭৫)

কেউ সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করতে চাইলে শয়তান তাকে এ কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। শয়তান তাকে বিভিন্নভাবে ভয়
দেখায়, হুমকি দেয় এবং বলে, মানুষের যা ইচ্ছা তারা তাই করুক, তাদেরকে বাধা দেওয়ার তুমি কে? তাদের মতো তারা থাক, তোমার মতো তুমি থাকো । খামোখা ঝামেলা করার দরকার কী। এরা তোমার কথা শুনবে না। তুমি এমনটি করতে গেলে তারা তোমার বিরোধী হয়ে যাবে। শুধু শুধু শত্রু বাড়িয়ে কী লাভ বলো?

এভাবেই শয়তান তার বন্ধুদের ব্যাপারে মানুষকে ভয় দেখায় এবং তাদেরকে সৎকাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহর খাঁটি বান্দাগণ

শয়তানকে ভয় পায় না। তারা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ অব্যাহত রাখে। বরং শয়তানের বন্ধুরাই কেবল তাকে ভয় পায়।

সুতরাং মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য শয়তানের ফাঁদ ও পদ্ধতির কোনো অভাব নেই। সে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে এবং পরিস্থিতির বিবেচনায় নিজের চেহারা বদলায়। সে নিঃস্বার্থ উপকারি বন্ধুর লেবাসে মানুষের সামনে আসে কিন্তু তার লেবাসের আড়ালে লুকিয়ে থাকে বিষধর গোখরা সাপ, যার এক ছোবলই জীবন শেষ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

শয়তানের অস্ত্রসমূহ

মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য শয়তানের পন্থা ও পদ্ধতি যেমন অনেক,ঠিক তেমনিভাবে মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য শয়তানের অস্ত্র ও মাধ্যমও
অনেক। নিম্নে তার কয়েকটা বর্ণনা করা হলো :

মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য শয়তানের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো, মদ বানেশাদ্রব্য। মদকে সকল অপরাধের জননীও বলা হয়। মদ এমন বস্তু যা।
মানুষের আকলকে বিকল করে দেয় এবং তাকে নেশাগ্রস্ত উন্মাদে পরিণত করে। মদের প্রভাবে নেশাগ্রস্ত হয়ে মানুষ অনেক বড় বড় অপরাধ করে বসে, অথচ নেশামুক্ত স্বাভাবিক অবস্থায় সে এমন অপরাধ করার কথা চিন্তাই করত না কখনো। আহ! আজ এই নেশার কারণে কত সম্পর্কই-না ভেঙে যাচ্ছে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ ঘটছে। কত পরিবার ধ্বংস হচ্ছে! কত প্রতিভা নষ্ট
হচ্ছে! বাবা-মার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কত সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাচ্ছে! ধনী ফকির হচ্ছে। নেশাগ্রস্ত সন্তানের কারণে বাবা-মা লাঞ্ছিত হচ্ছে,
মানসম্মান ও ধনসম্পদ হারিয়ে পথে বসছে!

কথিত আছে, এক দুশ্চরিত্রা নারী একটি শিশুসন্তান এবং এক গ্লাস মদ নিয়ে এক আবেদের দরবারে এসে তিনটি বিষয়ের কোনো একটি বেছে নেওয়ার ব্যাপারে তাকে চাপাচাপি করল,
১. হয়তো তার সাথে জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত
হবে।
২. শিশুসন্তানটিকে হত্যা করতে হবে।
৩. নয়তো মদ পান করতে হবে।
আবেদ লোকটি ভাবল, জিনা করা অনেক খারাপ কাজ, সুতরাং জিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া যাবে না। আর নিরপরাধ নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা

তো আরও বড় অপরাধ। এ দুটোর তুলনায় মদ পান করাই বরং সহজ ও অপরাধের দিক থেকে হালকা । সুতরাং সে বলল, আমি বরং মদই পান করব, জিনা এবং শিশুহত্যা করতে পারব না। অতঃপর যখন সে মদ পান করল, তার আকল বিকল হলো, সাধারণ বিবেক-বিবেচনা হারিয়ে গেল, সে নেশাগ্রস্ত উন্মাদে পরিণত হলো। মদের আরবি নাম হলো খমর, খমরের অর্থ হলে ঢেকে দেওয়া। মদকে খমর বলার কারণ হলো, যেহেতু তা মানুষের আকল ও বিবেককে ঢেকে দেয়, যার ফলে মানুষ আর ভালো-মন্দ চিন্তা করতে পারে
না।সুতরাং আবেদ লোকটি মদ পান করল। অতঃপর সে নেশাগ্রস্ত হয়ে মাহলাটির সাথে জিনায় লিপ্ত হলো, অতঃপর মহিলাকে এবং তার সাথে থাকা শিশুটিকে হত্যা করল।[১]

আর এ কারণেই নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদকে সকল মন্দ ও খারাপের চাবিকাঠি বলে উল্লেখ করেছেন। হাদিস শরিফে এসেছে, আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মদ পান করবে না, কারণ মদ হচ্ছে সকল মন্দের চাবিকাঠি। (ইবনে মাজাহ, ৪০৩৪)

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য শয়তানের আরেকটি বড় অস্ত্র হলো গানবাজনা । বর্তমান সময়ে তো এর ধ্বংসযজ্ঞ এতটাই ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে, কোনো ঘরই এর থেকে মুক্তি পাচ্ছে না। এমনকি মসজিদের ভেতরেও মানুষ শয়তানের এই অস্ত্রের আক্রমণের শিকার হচ্ছে। গানের প্রভাবে মানুষের অন্তর উদাসীন হয়ে যায় । গান এবং কুরআন মানুষের অন্তরে একসাথে থাকতে পারে না। গান হলো শয়তানের বাঁশি। শয়তান যে অন্তরে বাঁশি বাজায়, সেই অন্তরে কুরআন প্রবেশ করে না।

মানুষ যদি আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত কোনো কাজ করে তাহলে তাতে শয়তান হস্তক্ষেপ করে। মানুষ আল্লাহর নাম নেওয়া ব্যতীত তার পরিবারের কাছে এলে শয়তান তাতে প্রবেশ করে, আল্লাহর নাম ব্যতীত খাবার খেলে শয়তান তাতে শরিক থাকে । আল্লাহর নাম নেওয়া ব্যতীত ঘরে প্রবেশ করলে শয়তান তাতে প্রবেশ করে। সুতরাং চিন্তা করলে বুঝা যায়, বর্তমানে এমন কত ঘর রয়েছে যাতে শয়তান বসবাস করে। তুলার স্তূপে আগুন যেমন ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের ঘরে ও সমাজে গানবাজনাও ঠিক তেমনই ছড়িয়ে পড়েছে। আপনি রাস্তায় হাঁটবেন, সেখানে গান শুনতে পাবেন; গাড়িতে উঠবেন, সেখানে গান শুনতে পাবেন; বাজারে যাবেন, সেখানে গান শুনতে
পাবেন; স্টেশনে যাবেন, সেখানে গান শুনতে পাবেন; প্লেনে যাবেন সেখানে গান,

এমনকি আপনার নিজের টাকায় বানানো ঘরে বসেও আপনি গান থেকে মুক্তি পাবেন না। আল্লাহর পানাহ, বর্তমানে তো আল্লাহর ঘর মসজিদও গান মুক্ত নয়, মসজিদে গিয়েও তুমি গানের আওয়াজ শুনতে পাবেন।

এর ফলে উদাসীনতা, অশ্লীলতা, জিনা-ব্যভিচার, মদ, জুয়া, নারীর শরীর নিয়ে খারাপ চিন্তা, বিভিন্ন কুফফার দেশে ভ্রমণ করার
আগ্রহ বেড়ে চলেছে। সময়,
অর্থ ও মেধার অপচয় হচ্ছে।

গানের মুহাব্বত আর কুরআনের মুহাব্বত অন্তরে একসাথে থাকতে পারে না । দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী জিনিস। কুরআন মানুষের অন্তরকে নরম করে আর গানবাজনা মানুষের অন্তরকে শক্ত এবং পাথরের চেয়েও কঠিন করে
তোলে ।

মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য শয়তানের আরেকটি অস্ত্র হলো, জাদুটোনাকারী,
গণক ও জ্যোতিষীগণ । তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে পথভ্রষ্ট করে, মানুষের মাঝে
বিরোধ সৃষ্টি করে । স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে তাদের ঘর ভাঙে ।
শয়তানের সবচেয়ে বড় অস্ত্রগুলোর মধ্যে একটি হলো, বেহায়া-নির্লজ্জ বেদ্বীন নারী । এমন কলঙ্কিণী নারীরাই হলো শয়তানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। শয়তান যখন নেককার পুরুষের ব্যাপারে সকল দিক থেকে ব্যর্থ হয়ে যায়, তখন
সে 'নারী-অস্ত্র' ব্যবহার করে। মুসলিম ও বুখারি শরিফে একটি দীর্ঘ হাদিসে এসেছে, নবী কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের বলেন,পুরুষদের বিবেককে অকেজোকারী তোমাদের চেয়ে অগ্রগামী আর কাউকে
দেখিনি । (সহিহ মুসলিম, ৭৯)

ঈমানের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা

প্রাথমিকভাবে শয়তান বান্দার মনে এই ধারণা পেশ করে যে, ঈমান বা বিশ্বাস পিতামাতার কাছ থেকে আসে । একবার ঈমান আনলে বা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এটি গ্রহণ করলেই হয়, এটি চিরকাল অটুট থাকে। এর ফলে সব আমলের চর্চা হলেও ঈমানের পরিচর্যা করা হয় না। নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আমল নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ অনেকেই বেশ চিন্তিত কিন্তু সব আমলের মূল ভিত্তি ঈমান নিয়ে কয়জন চিন্তিত থাকে? অথচ ঈমান হলো সমস্ত আমলের মূল ভিত্তি!

ইসলামে ঈমান একটি চলমান প্রক্রিয়া। ঈমান কেবল একবার উচ্চারণ করলেই শেষ নয়; এটি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধরে রাখা এবং নবায়ন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ঈমান কখনো বৃদ্ধি পায় আবার কখনো দুর্বল হয়ে যায়। শয়তান মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং ঈমান দুর্বল করার চেষ্টা করে। সে বলে যে, আরে বাপ-দাদার সূত্রে মুসলমান তো হয়েই আছি ঈমান আবার কিভাবে ঠিক করে? আমি তো আর অন্য কাউকে রব বলে স্বীকার করছি না, শিরক করছি না। ঈমানের ক্ষেত্রে এই ধোঁকা মানুষকে ঈমানের পরিচর্যার ব্যাপারে গাফেল করে দেয়। এক পর্যায়ে এই গাফিলতি মানুষকে ঈমানহীন করে জাহান্নামে পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে।

মূল ঈমান স্থির থাকলেও স্বাভাবিকভাবে পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ঈমানের স্তর উঠানামা করে। সাহাবায়ে কেরামের মাঝেও এমনটা হতো। তাহলে আমাদের কি অবস্থা তা বলাই বাহুল্য! মূলত ঈমানের কমতির কারণ হলো ঈমানী পরিবেশ থেকে দূরে থাকা, গুনাহের পরিবেশে বেশি থাকা। এমনিভাবে অসৎ সঙ্গের কারণেও ওই ঈমানের ঘাটতি হয়।অন্তরে ঈমানের নূর কমতে থাকে যদি ঈমানী পরিবেশ থেকে দূরে থাকা হয়। মানুষের অন্তরে যখন ঈমান তাজা থাকে তখন সামান্য গুনাহের কারণেই দিল ব্যথিত হয়। আল্লাহর ভয়ে দিল কুঁকড়ে যায়। অন্যথায় এত গুনাহের পরও দিলের কোন পরিবর্তন হয় না, অন্তরে কখনো আঘাত লাগে না। এটাই ঈমানের কমতির আলামত।

কাফের মুশরিকদের জন্য যেমন ঈমান আনা ফরজ তেমনি একজন মুসলমানের জন্য নিজের ঈমানকে রক্ষা করাও ফরজ। তাই ঈমান বিধ্বংসী বিষয়গুলোর ব্যাপারে সচেতন থাকার কোন বিকল্প নেই। শয়তানে ধোঁকায় পড়ে এসব ব্যাপারে গাফেল থাকার কারণে কেউ দ্বীনের কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করে ও নিজেকে ঈমানদার ভেবে বসে। দ্বীনের বিভিন্ন সুস্পষ্ট ফরজ বিধান নিয়ে বাজে মন্তব্য ও বিধানকে অস্বীকার করেও নিজেকে পাক্কা মুমিন ভাবে। এমনকি কেউ কেউ তো বলেই ফেলে, 'নামাজ না পড়লে কি হবে, ঈমান ঠিক আছে'!অথচ নামাজ হলো ঈমানের অন্যতম পরিচয়। একাধিক হাদিস দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয়, নামাজ ঈমান ও কুফরের মাঝে পার্থক্য।

মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নেক কাজে আনন্দিত হয় এবং গুনাহের কাজে ব্যথিত হয়। হাদিসে খুবই সুন্দর ভাবে বিষয়টি চিত্রিত হয়েছে,

আবু উমামা রাযি.হতে বর্ণিত, এক সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করল, "ইয়া রাসুল আল্লাহ ঈমান কি জিনিস?" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমার নেক কাজের কারণে যদি তুমি আনন্দিত হও আর তোমার গুনাহের কারণে যদি তুমি ব্যথিত হও তাহলে তুমি মুমিন।"

নামাজ আদায়কারীকে জামাতের ব্যাপারে শয়তানের ধোকা

নামাজের জামাতে অংশগ্রহণ করা ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জামাতের মাধ্যমে মুসলিমদের ভ্রাতৃত্ববোধ বৃদ্ধি পায় এবং একসঙ্গে আল্লাহর ইবাদত করার মাধ্যমে একাত্মতা প্রকাশ করা হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"তোমরা সবাই আল্লাহর রশি (দীন) দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।"
(সূরা আলে ইমরান: ১০৩)

জামাতে নামাজ আদায়ের মাধ্যমে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ থাকে, যা শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা করে।

তবে শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে ধোঁকা দিয়ে জামাতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।শয়তানের মূল লক্ষ্য হলো তাকে একা নামাজ আদায়ের দিকে প্রলুব্ধ করা এবং জামাতের ফজিলত থেকে বঞ্চিত করা। শয়তানের এই ধোঁকার মধ্যে কয়েকটি প্রধান পদ্ধতি হলো:

১.সময় সম্পর্কে অলসতা ঢোকানো: শয়তান ব্যক্তিকে মনে করিয়ে দেয় যে সময় এখনো আছে বা জামাতে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া কষ্টকর। এর ফলে ব্যক্তি নামাজের সময় পার করে দেয় বা একা নামাজ পড়ে।

২. **অপ্রয়োজনীয় ব্যস্ততা তৈরি:** শয়তান নানা অজুহাত তৈরি করে, যেমন ঘরের কাজ, ব্যক্তিগত ব্যস্ততা বা আরাম করার প্রয়োজন। এভাবে জামাতে অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টি করে।

৩. **মানসিক বিভ্রান্তি:** শয়তান মানুষের মনে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, যেমন জামাতে গিয়ে নামাজের একাগ্রতা নষ্ট হতে পারে বা লোক দেখানো হতে পারে ।কিছু লোক এই অজুহাতে মসজিদে উপস্থিত হয় না যে, ইমাম সাহেবের কেরাত সুন্দর নাম বা ভালো না। এজন্য সে বাসায় নামাজ আদায় করে। এটাও শয়তানের একটি ধোকা।
রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন:

"নেককার মুমিনরা জামাতের ভেড়ার মতো একত্র থাকে, আর শয়তান একাকী ব্যক্তির কাছে আসে।"
(তিরমিজি: ২১৬৫)
জামাতে অংশগ্রহণ না করলে মুমিনরা একাকী হয়ে শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়।

৪. **জামাতের গুরুত্ব কমিয়ে দেখানো:** শয়তান মনে করায় যে একা নামাজ পড়লেও জামাতের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে, যা সম্পূর্ণ ভুল। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:
"জামাতে আদায় করা নামাজ একাকী নামাজের চেয়ে ২৭ গুণ বেশি উত্তম।"
(সহিহ বুখারি: ৬৪৫, সহিহ মুসলিম: ৬৫০)

শয়তান মানুষের মনে অলসতা বা অজুহাত সৃষ্টি করে জামাত থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

সুন্নত ও বিতর নামাজ আদায়ের শয়তানের ধোকা

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে মোট ১২ রাকাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা নামাজ রয়েছে।হাদিসের মধ্যে এর গুরুত্ব ও ফজিলতের কথা একাধিকবার এসেছে। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা রাদি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,
مَنْ ثَابَرَ عَلَى ثِنْتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ

যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিয়মিত বার রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর বানিয়ে দিবেনঃ যোহরের পূর্বে চার রাকআত, এরপর দু'রাকআত, মাগরিবের পর দু'রাকআত এশার পর দু'রাকআত, ফজরের পূর্বে দু'রাকআত। (জা'মে তিরমিযী, ৪১৪, সহীহ, সুনানুন নাসাঈ, হাদীস নং ১৭৯৫, সহীহ)

কিন্তু এসব সুন্নত নামাজ আদায়ে এই গাফিলতি করেন। শয়তান অনেক নেককার বান্দাকে নেক সুরতে ধোকা দিয়ে নামাজের আগে পরের সুন্নত নামাজ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।শয়তান কোন দ্বীনদার ব্যক্তিকে, আলেম বা লেখক কে এইভাবে ধোঁকা দেয় যে, এখন কিতাব পড়াতে হবে বা লিখতে হবে।এই অজুহাতে সুন্নত পড়ার ক্ষেত্রে অবহেলা করেন। সাধারণ মানুষ দুনিয়াবী কাজের ব্যস্ততায় সুন্নত ছেড়ে দেন। তারা ভাবেন, সুন্নতই তো , একদিন না পড়লেও হবে। আসলে বাস্তবতা হলো, নামাজের ঠিক আগ মুহূর্তে কাজে প্রচুর মনোযোগ চলে আসে।তখন কাজ ফেলে উঠতেই ইচ্ছে হয় না। এটা নিঃসন্দেহে শয়তানের ধোকা।

শয়তান আমাদের সামনে যেসব প্রয়োজন দাঁড় করায়, ভালোভাবে ভাবলে দেখা যাবে,সেসবের কোনটিই বিশেষ প্রয়োজন না।মাত্র কয়েক মিনিট ব্যয় করে দুই চার রাকাত সুন্নাত পড়লে খুব বড় কোন সমস্যাই হবে না,বরং বিশাল সওয়াবের অধিকারী হবে।অথচ শয়তানের ধোকায় পড়ে এ জাতীয় ছোটখাটো কারণে সুন্নাত নামাজ ত্যাগ করতে করতে এক পর্যায়ে বিনা কারণেই সুন্নাত নামাজ ত্যাগ করা শুরু হয়ে যায়। শয়তান তো এটাই চায়।সুন্নাত থেকে শুরু করে এভাবে ধীরে ধীরে আরো অগ্রসর হয়ে এক পর্যায়ে তাকে ফরজ নামাজ থেকেও দূরে সরিয়ে দিতে পারে শয়তান।

বিতর নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রেও শয়তান আমাদেরকে বিভিন্ন ধোকা দিয়ে থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় ভেতরের নামাজ শেষ রাতে আদায় করা উত্তম। কারণ হাদিসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন -

اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا

তোমরা বিতরকে রাতের শেষ নামাজ বানাও
(সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৯৯৮; সহিহ মুসলিম,৭৪৯)
কিন্তু অনেকেই এক্ষেত্রে ধোঁকায় পতিত হন। তারা শেষ রাতে আদায়ের নিয়তে রাতের প্রথম প্রহরে বিতর আদায় করেন না। কিন্তু অভ্যস্ত না হওয়ায় অবশেষে শেষ রাতেও উঠতে পারেন না।ফলে বিতর আর পড়াই হয় না। উপরে হাদিসটি তাদের জন্য, যারা শেষ রাতে ওঠেন বা উঠতে পারবেন বলে নিজের উপর আস্থা আছে। কিন্তু যারা শেষ রাতে উঠতে অভ্যস্ত নন বা ঘুম গভীর হওয়ার কারণে ওঠার তেমন সম্ভাবনাও নেই তাদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা হল,
‘যে লোক আশঙ্কা করে যে শেষ রাতে উঠতে পারবে না সেজন্য প্রথম রাতে বিতরের সালাত আদায় করে নেয়। আর যে লোক শেষ রাতে উঠতে পারবে বলে মনে করে সে যেন শেষ রাতেই ভিতরে সালাত আদায় করে এই জন্য যে শেষ রাতে সালাতে ফেরেশতাগণ উপস্থিত হন। আর (জাগ্রত হতে পারলে শেষ রাতে বিতর) আদায় করাই অধিক উত্তম।’(সহীহ মুসলিম হাদিস নং ৭৫৫;জামে তিরমিজি, ৪৫৫)
তাই শেষ রাতে যাদের ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার অভ্যাস নেই তাদের জন্য প্রথম রাতেই বিতর আদায় করে নেয়া জরুরি। প্রথম রাতেই এশার নামাজের পর দুই চার রাকাত নফল আদায়ের পরে বিতর আদায় করা যায়।

কেরাত-সংশ্লিষ্ট ধোঁকা

সালাতের সুললিত সুরে তেলাওয়াত করা উত্তম। আল্লাহতায়ালা কুরআন পড়তে বলেছেন তারতিলের সাথে,

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا

'আর তোমরা তারতিলের সাথে কুরআন তিলাওয়াত কর।' (সূরা মুযযাম্মিল, ৪)

সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণের সাথে তিলাওয়াত করাই হলো তারতিল। আর এর দ্বারা স্বরের মধ্যেও যে মাধুর্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তা সহজে অনুমান করা যায়।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তাবিয়ীন ও তাবি- তাবিয়ীনও সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করতেন।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

যে সুন্দর স্বরে তেলাওয়াত করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত না। (সহিহ বুখারী, হাদিস নং ৭৫২৭;সহীহ মুসলিম ৭৯২)
সুললিত কণ্ঠের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে,স্বাভাবিকভাবে মাখরাজ মদের উচ্চারণ সহ শুদ্ধ করে তিলাওয়াত করা। নিজের সুরটুকু তিলাওয়াতে ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করা। সুন্দর কণ্ঠে তেলাওয়াত করার দ্বারা মুসল্লিদের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। নামাজেও তৃপ্তি পাওয়া যায়।কিন্তু শয়তান এখানেও ঘাপটি মেরে বসে থাকে। অনেকের সুর দিয়ে পড়ার উদ্দেশ্য থাকে মানুষ যাতে প্রশংসা করে।তখন তো এটা আল্লাহতালার জন্য হলো না। অনেকে তো আবার এ উদ্দেশ্যে অন্যের সুর নকল করার চেষ্টা করে। মৌলিকভাবে এটি অন্যায় না হলেও কখনো সুর নকল করতে যেয়ে তিলাওয়াতই বিকৃত হয়ে যায়। তখন আর তিলাওয়াতের সৌন্দর্য বাকি থাকে না। ফলে মনোযোগ আসা তো দূর,প্রচন্ড তিক্ততা এসে যায়।

কেউ কেউ তিলাওয়াতে সুর দিতে গিয়ে শব্দ উচ্চারণে বিকৃতি করে ফেলেন,সুরের প্রতি খেয়াল রাখতে গিয়ে অথবা সুরের সামাল দিতে গিয়ে অর্থ বুঝে ওয়াকফ করেন না। ফলে অর্থই পরিবর্তন হয়ে যায়। এমনকি ওয়াকফ লাযিমেও থামতে ভুলে যান। সুরের প্রতি অধিক ঝোঁক সমস্যা তৈরি করলে অর্থ বুঝে স্বাভাবিক সুরে তেলাওয়াত করাই উত্তম। সুর যেন কাউকে ধোঁকায় ফেলে না দেয়।

মসজিদের আদব সমূহের মধ্যে একটি যে,অপ্রয়োজনীয় উচ্চ আওয়াজ না করা।উলামায়ে কেরাম বলেন,মসজিদে অপ্রয়োজনীয় উচ্চ আওয়াজে তিলাওয়াত করা,বয়ান করা ইত্যাদি মাকরূহ হবে।মাইকে তিলাওয়াত করার কারণে এই আওয়াজ আরো বিদঘুটে হয়ে যায়। এতে নামাজের মনোযোগ নষ্ট হয়। তাই এই ধরনের বিদঘুটে তিলাওয়াত থেকে বিরত থাকা জরুরী।নামাজের মধ্যে মধ্যম আওয়াজে তেলাওয়াত করার কথা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰ لِكَ سَبِيْلًا

'আর আপনি সালাতে স্বর খুব উচ্চ করবেন না আবার খুব ক্ষীণও করবেন না বরং এই দুইয়ের মধ্যে পথ অবলম্বন করুন।'(সূরা বনী ইসরাঈল,১১০)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়,নামাজে তিলাওয়াত হবে মধ্যম ধরনের আওয়াজে। যতটুকু আওয়াজে মুসল্লিগণ স্পষ্টভাবে তিলাওয়াত বুঝতে পারেন।

অনেকে তাহাজ্জুদের নামাযে একটু বেশি উচ্চ আওয়াজে তেলাওয়াত করেন। এভাবে উঁচু আওয়াজে তেলাওয়াত করা কোনভাবেই উচিত নয়। এক্ষেত্রে দুই ধরনের সমস্যা হয়: প্রথমত,তিলাওয়াতের আওয়াজ উঁচু হওয়ার দরুন কারণে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রবল থাকে, কারণ রাতের নীরবতায় সামান্য শব্দই অনেক জোরে শোনা যায়। আবার তেলাওয়াত করলে অন্য তাহাজ্জুদ আদায়কারীর ও সমস্যা হয়, নামাজে একাগ্রতা আনা সম্ভব হয় না, আবার তিলাওয়াতেও প্যাচ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কেরাত সংশ্লিষ্ট আরেকটি ধোঁকা হল, ফরজ নামাজের তিলাওয়াতে মাসনুন কেরাতের প্রতি লক্ষ্য না রাখা। যথাসম্ভব বিশেষ কোন হালাত না হলে হাদিসে বর্ণিত মাসনুন কেরাতের ব্যাপারে যত্নবান থাকা চাই। ব্যস্ত মুসল্লির সংখ্যা বেশি থাকে হাটহাজারের মসজিদ, রাস্তার পাশের মসজিদ এবং স্টেশন ও তার আশেপাশের এলাকার মসজিদগুলোতে।তাদের বিভিন্ন ধরনের তাড়া থাকায় তাড়াতাড়ি নামাজ থেকে ফারেগ হতে চান। কেরাত দীর্ঘ হলে তাদের জন্য নামাজ পড়া কষ্টকর হয়ে যায়। আর যে মসজিদ এমন নয় সেখানে অবস্থা ভিন্ন রকম হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে ইমামের পেছনে শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তিও থাকতে পারে।

এ ধরনের বিভিন্ন হালত ও অবস্থা বিবেচনায় রেখে ফুকাহায়ে কেরাম যে উসুল বলেছেন তার মূল কথা হলো, ইমাম সাহেবের কর্তব্য হচ্ছে মুসল্লিদের হালতের প্রতি খেয়াল রাখা।

কিয়ামুল লাইল- কেন্দ্রিক শয়তানের ধোঁকা

কিয়ামুল লাইল আল্লাহ তায়ালার খুব পছন্দের একটি ইবাদত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই নামাজ দীর্ঘ করে পড়তেন। এমনকি তার পা মোবারক ফুলে যেত। অনেক সালাফ থেকে পাওয়া যায়, তারা নামাজে এক সূরা বা এক আয়াত বারবার পড়তে পড়তেই সারারাত কাটিয়ে দিতেন।

এই সালাতে শয়তান মারাত্মক পর্যায়ের সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। শয়তান আমাদের বেশিরভাগ কে আল্লাহ তায়ালার অতি পছন্দনীয় কিয়ামুল লাইলের ব্যাপারে চরম গাফেল ও উদাসীন করে ফেলেছে। অথচ কুরআন-সুন্নাহয় এ বিষয়ে কি তাগিদটাই না এসেছে! আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰۤى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا

আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম কর, তোমার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে । আশা করা যায় তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে
প্রতিষ্ঠিত করবেন। (সূরা বনী ইসরাইল, ৭৯)

তবে কিয়ামুল লাইল আদায়েও আমাদেরকে সচেতন হতে হবে।জোশ ও হুশের সাথে আমাদেরকে ইবাদতে আত্মনিয়োগ করতে হবে। অনেক আবেদকে শয়তান এমন ধোকা দেয় যে, সে লম্বা রাকাতে নফল পড়তে গিয়ে ফরজ বিষয়ে অবহেলা শুরু করে। সারা রাত নামাজ পড়ে কেউ কেউ একাকী নামাজ পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে। অথচ এভাবে সারারাত নফল নামাজ পড়ে জামাত ছাড়া একাকি নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে যাওয়ার চেয়ে সারারাত ঘুমিয়ে ফজর জামাতে আদায় করাই উত্তম ছিল। কেউ কেউ এভাবে লম্বা রাকাতে নামাজ পড়তে গিয়ে শরীর দুর্বল করে ফেলে। ফলে অন্যান্য কাজে ব্যাঘাত ঘটে। বিশেষ করে ছাত্রদের জন্য এটা মারাত্মক ধোকা। কিছু ছাত্র পেয়েছি যারা লম্বা রাকাতে প্রতিদিনই সালাতুত তাসবিহের নামাজ আদায় করতো কিন্তু পরদিন তারা দারসে বসে ঝিমাতো। আমাদের উপর আমাদের শরীরের কিছু হক রয়েছে। এই দেহ কোন রোবট নয় যে ক্লান্ত হবে না। আল্লাহ তাআলা রাত কে বানিয়েছে মানুষের বিশ্রামের জন্যই। রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে কিছু অংশ ইবাদত করাই সমীচীন।

আমাদের দেশে বিভিন্ন বরকতময় রাত উপলক্ষে মসজিদে সারারাত নামাজ পড়ার রীতি চালু আছে। এবং এটা বেশ ঘটা করেই পালন করা হয়। এক্ষেত্রে শয়তানের কিছু ধোকা উল্লেখযোগ্য। এভাবে সারারাত জেগে নামাজ পড়ে অনেকেই ফজর পড়তে পারেন না। কিছু লোক শুধু ওই একদিনই নামাজ পড়াকে যথেষ্ট মনে করেন। এছাড়া তাদেরকে মসজিদে খুব

একটা দেখা যায় না। এটা কেউ কেউ আছে পুনরার জাগ্রত থাকলেও একদমই নামাজ পড়েন না। বয়ান শুনে মসজিদেই ঘুমিয়ে পড়েন অথচ মসজিদে ইতিকাফের নিয়ত ও মোটা বিছানা ছাড়া শোয়া আদবের খেলাফ।

এজন্য উত্তম হলো এসব বরকতময় রাতে নিজের ঘরেই নফল নামাজ পড়া।তবে মসজিদে পড়তে কোন শহরেই নিষেধাজ্ঞা নেই। ঘরে পড়া উত্তম বলার কারণ অনেক সময় মসজিদে ভিড়ের কারণে খুশু-খুজুর সাথে নামাজ পড়া সম্ভব হয় না। আবার ঘরে পড়ার কারণে এতে শয়তানের ধোঁকায় পড়ার আশঙ্কাও থাকে না; আর এভাবে ঘরে আমাদের পরিবেশেও তৈরি হবে।

এ দিনগুলোতে একটি তিক্তকর অভিজ্ঞতা হল এসব বরকতময় রাতে কোথাও কোথাও ইবাদতের চেয়ে গুনাহের পরিমাণ বেশি হয়ে যায়। রাতের কিছু অংশে ইবাদত বন্দেগী হলেও এরপর বেশিরভাগই মসজিদে আদব রক্ষা না করে মসজিদে ঘুমিয়ে পড়েন। এলাকার যুবক ছেলেরা মসজিদের ছাদে গিয়ে গল্প-গুজব করে,এতেও মসজিদের হুরমত নষ্ট হয়। কেউ কেউ আবার পুরো রাতদল বেধে ঘুরে বেড়ায়।কেউ কেউ আরও আগ বাড়িয়ে বসেই মোবাইলে গান ছবি দেখে বা গেমস খেলে। এটাতো আরো মারাত্মক অপরাধ। এজন্য মসজিদের ইমাম সাহেবদের কর্তব্য হলো ফজিলতের রাতগুলো কিভাবে কাটানো উচিত এই বিষয়ে মুসল্লীদের আগেভাগেই বিশদ আলোচনা তুলে ধরা।

মোটকথা রাতের নামাজ যেন হয় কেবলই আল্লাহতালার জন্য।

নামাজে পরিধেয় পোশাকের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা

আল্লাহর সাথে কথোপকথন হল নামাজ। এটি একমাত্র আল্লাহর সাথে সংযোগ স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ফলে একজন বান্দার জীবনে নামাযের তাৎপর্য অনেক বেশি।

স্বাভাবিকভাবে দুনিয়াবী কাজগুলোতে আমরা যেরকম গুরুত্ব দিয়ে থাকি নামাজের ক্ষেত্রে গুরুত্ব তার চেয়েও বেশি হওয়া উচিত। অথচ বাস্তবে হয় এর উল্টো। দুনিয়ার সব জায়গাতেই সুন্দর উত্তম পোশাক পরিধান করলেও নামাজের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা উত্তম পোশাক নির্বাচনের বিষয় যথাযথ গুরুত্ব দেই না। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

يٰبَنِىٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ

হে বনী আদম ! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করো।

(সূরা আরাফ, ৩১)

এখানে সুন্দর পোশাক বলতে দামি পোশাক বোঝানো হয়নি বরং উত্তম পোশাক বোঝানো হয়েছে।পোশাক কম দামি হোক কিন্তু সেটাই যেন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়। পোশাক তালি যুক্ত হোক কিন্তু সেটা যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়।
অনেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন উত্তম পোশাক থাকা সত্ত্বেও নামাজে ময়লা ও ছেড়া ফাটা কাপড় পড়ে দাঁড়ায়। মাসালা অনুযায়ী নামাজ ঠিক হয়ে গেলেও বাস্তবে দেখা যায় যে,তারা দুনিয়াবী অন্যান্য কাজে উত্তম পোশাক পরিধান করে, আর নামাজের ক্ষেত্রেই কেবল এ ধরনের পোশাক পরিধান করে, তাহলে বুঝতে হবে এটা নিশ্চিত শয়তানের ধোঁকা।

কেউ কেউ অজুহাত দেন, সারাদিন শরীর পবিত্র থাকে না, তাই নামাজের জন্য একটা আলাদা পোশাক রেখে দিয়েছি, ওটা পরে নামাজে যাযই। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় ওই পোশাকটি এক সপ্তাহ যাবৎ পরলেও পরিষ্কার করা হয় না।

আবার কারো কারো নামাজের পোশাক এত ময়লা থাকে যে দুর্গন্ধের কারণে পাশে দাঁড়ানোই কষ্টকর হয়ে যায়।এটা কখনোই কাম্য হতে পারে না ; বরং অন্যকে কষ্ট দেয়ার এবং নামাজের পরিবেশ নষ্ট করার কারণে তাকে গুনাগার হতে হবে।

আবার এর বিপরীত দিকেও শয়তানের ধোঁকা রয়েছে। কেউ কেউ পোশাক কেনায় অপচয় করে ফেলেন এই ভেবে যে,নামাজে উত্তম ও সুন্দর পোশাক পরিধান করতে হবে।তারা মনে করে, ঈদের দিন নতুন পোশাক পরিধান করার সুন্নাত।এটা একটা ভুল ধারণা। কারণ নতুন কাপড় নয়, উত্তম পোশাক পরিধান করা ঈদের দিন সুন্নাহ।
এক্ষেত্রে এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে, নামাজে সুন্দর পোশাক পরিধান করতে গিয়ে যেন অহংকার চলে না আসে। কিছু লোক নামাজে সুন্দর পোশাক পরতে গিয়ে এমন পোশাক পরিধান করে মসজিদে আসেন, যারা তার নিজের নামাজকে মাকরূহ বানিয়ে ছাড়ে, আবার অন্যের নামাজেও সমস্যা করে। যেমন: কেউ এত ভারী কাজের জামা পরিধান করে এলো যে, নামাজের মধ্যে বারবার জামা ঠিক করতে হচ্ছে! তো বারবার জামা ঠিক করার কারণে নিজের নামাজ তো নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছেই, সাথে অন্যদের নামাজের খুশু খুজু নষ্ট হতে পারে।আজকাল অনেক যুবক আছে যারা বিভিন্ন ক্লাব কোম্পানি ও সংগঠনের লোগো ও বক্তব্য সংগঠিত গেঞ্জি পরিধান করে নামাজে অংশগ্রহণ করে থাকে।এতে নামাজে মুসল্লিদের মনঃসংযোগ ব্যাঘাত সৃষ্টির পাশাপাশি নিজের নামাজও হুমকির সম্মুখীন হয়।কারণ, এ সকল গেঞ্জির অনেকগুলাই এমন যা পরিধান করা নাজায়েজ। কোন ব্যক্তি খুব উজ্জ্বল রঙের পোশাক

পরিধান করে নামাজ পড়তে আসেন, এটা একদম উচিত নয়।এতে নামাজের মধ্যে অন্যের দৃষ্টি নামাজের জন্য অনিচ্ছায় হলেও ওই রঙের দিকে চলে যাবে।

নামাজের জন্য সবচেয়ে উত্তম পোশাক হচ্ছে সাদা রঙের পোশাক। সবসময়ের জন্য একই হুকুম। কারণ, সাদা রঙের পোশাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পছন্দ করতেন।

রোজা-সংক্রান্ত শয়তানের ধোঁকা

রোজা ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ এবং ফরজ বিধান। রোজা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই এবং আল্লাহই এর প্রতিদান দেন। রোজা মুমিনের জন্য ঢালস্বরূপ।

একমাস রমজান ব্যতীত বাকি দীর্ঘ ১১ মাস আমরা প্রকৃতির অনুসরণ করে নফসকে মোটা বানিয়ে ফেলি। ফলস্বরূপ ইবাদতের স্বাদ পাওয়া যায় না। রমজানের এই এক মাসে প্রকৃতির অনুসরণ ত্যাগ করে পানাহার স্ত্রীর সঙ্গে এসব থেকে দূরে থেকে বেশি বেশি ইবাদতের মাধ্যমে নফসকে আরো পরিশুদ্ধ করা হয়। কিন্তু নফসকে পরিশুদ্ধ করার বদলে নফ যদি আরও প্রকৃতির অনুসরণে হারিয়ে যায় তাহলে রোজার উদ্দেশ্য বিফলে যায়।
রমজান মাসে ইফতার ও সেহরিতে এত পরিমাণ খাওয়া হয়, যেন এই এক মাস পানাহার থেকে নয় বরং পানাহার বৃদ্ধির মাস। কেউ কেউ যুক্তি দেখান রমজানের বরকতে আল্লাহ তায়ালা নিজেকে বরকত দেন। আবার কেউ বলেন, ইফতার ও সেহরিতে দামি দামি খাবার খাওয়া হয় রমজানেরই সম্মানার্থে। এসবগুলোই শয়তানের ধোঁকা।

আনাস রাযি. বলেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাজের আগে তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তা না পেলে শুকনা খেজুর দিয়ে এবং তাও না পেলে কয়েক ঢোক পানি খেয়ে নিতেন। (জামে’ তিরমিজি হাদিস নং ৬৯৬, সহিহ)

মূলত নবীজি (স.), সাহাবায়ে কেরামগণ,তাবিয়ীন, তাবি- তাবিয়ীন ও সালাফগণ খুবই সাদাসিধা ইফতার করতেন।আমাদের এ যুগে এসে ইফতার হয়ে গেছে বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠানের মত। ফলে রোজা রেখে প্রবৃদ্ধি দমন তো দূরের কথা বাহারি ইফতার খেয়ে আরও বেশি পেট পূজা হয়ে যায়; যার রোজা ছাড়া অন্য মাসেও হয় না। সবাই যেন রোজার অপেক্ষায় থাকে যে রোজা এলেই বাহারি খাবারের পসরা সাজানো হবে এবং এটাকে অনেকে রোজার বরকত ভেবে বসে থাকে! তো সাদাসিধে ইফতার করে কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ বরকত থেকে মাহরুম থেকেছেন!

সারাদিন খালি পেট থাকার পর ইফতারে এমন বাহারি আয়োজন, রমজানের কাঙ্ক্ষিত বিষয় অধিক পরিমাণ ইবাদত বন্দেগির জন্য যেমন ক্ষতিকর, তেমনি ভাবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকেও এটা শরীরের জন্য ক্ষতিকর।
আমরা এত বেশি পরিমাণে ইফতারি খাই যে, ইফতারির পরে কোনরকম মাগরিবের নামাজ পড়ি বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে দিই, তাহলে এই রোজা আমাদের জন্য শয়তানের বিরুদ্ধে কিভাবে ঢাল হবে?

কেউ কেউ এই ভারী ইফতারের কারণে তারাবীতে শরিক হতে পারেন না। আবার কেউ কোন রকম তারাবীটা পড়তে পারলেও বাসায় ফিরেই আর শরীরটা ধরে রাখতে পারেন না।বিছানায় গা এলিয়েই লম্বা ঘুম, সেহরির শেষপ্রান্তে এসে কোনরকম সেহরি খেয়ে আবারো ঘুম। একজন মুমিনের সারা বছরই খাওয়া ঘুম পর্যাপ্ত পরিমাণে হলেও রমজান মাসে সে খাওয়া ঘুমের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে ইবাদতে বেশি সময় দেবে এটাই তো হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এখন হয় উল্টো। অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান মাসে খাওয়া আর ঘুমের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। ফলে রমজান মাসে ইবাদত বেশি করে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য পাওয়ার বদলে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তাঁর থেকে আরো দূরে চলে যায়।

আবার মুদ্রার ওপিঠও আছে। শয়তানের উল্টো ধোঁকায় পড়ে কেউ কেউ রমজান মাসে এত পরিমাণ যুহদ অবলম্বন করেন যে, এক পর্যায়ে আর আমল করতে পারেন না। মানুষের সহ্য ক্ষমতার সীমা আছে। অবশ্যই সীমা নির্ধারিত নয়, চেষ্টা করলে একে বাড়ানো যায়। কিন্তু সারা বছর স্বাভাবিক নিয়মে চলে কেউ যখন শুধু রমজান মাসেই এই সীমা পেরোতে চায়, তখনই সে সহ্য ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।এতে অসুস্থ হয়ে পড়া সহ নানাবিধ সমস্যায় ভুগতে হয়। ফলে রমজানের স্বাভাবিক আমলে ব্যত্যয় ঘটে। এজন্য উচিত হলো রমজানের আগ থেকে রমজানের প্রস্তুতি নেওয়া। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমজানের দুই মাস আগে থেকেই অর্থাৎ রজব শাবান মাস থেকে রমজানের প্রস্তুতি নিতেন।

রমজানে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখা চাই, নফল আমল বেশি করতে গিয়ে যাতে ফরজ আমল ঘাটতি না হয়। অনেকে ভাবেন, রোজার গুরুত্ব বোধ হয় শুধু সেহরি থেকে ইফতার পর্যন্তই। শুধু এই সময়টুকু গুনাহ থেকে বাঁচালেই হবে। বাকি সময় গুনাহের কোন পরোয়া না করলেও চলবে। এটা শয়তানের মারাত্মক একটি ধোঁকা। পরে দেখা যায়, ইফতার সেরেই সিগারেট খাওয়া হয়।মাগরিবের নামাজ পড়ে বাসায় এসেই টিভি বা মোবাইলে মুভি বা গান দেখা শুরু হয়ে যায়। শয়তান অন্তরে আগে থেকেই বসিয়ে দেয়,রোজা অবস্থায় এগুলো করা যাবে না ইফতারের পর করিস। অথচ এই কাজগুলো পুরো বছর ব্যাপী নিষিদ্ধ। তাই বছরের কোন সময় এই ধরনের গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

রমজান মাসে মোবাইল একান্ত প্রয়োজন ছাড়া ব্যবহার করা উচিত নয়। অফিসিয়াল কোন কাজকর্ম না থাকলে এই একমাস ইন্টারনেট থেকে দূরে থাকা উচিত। শয়তান ধোঁকা দিতে পারে - ইউটিউবে গিয়ে কারো বয়ান শুনে আয়,তিলাওয়াত শুনে আয়, সওয়াব হবে। এটা ভেবে আপনি ইউটিউবে ঢুকলেন, বয়ান শুনলেন বা তিলাওয়াত শুনলেন,এরপর হঠাৎ করেই একটা বাজে দৃশ্য আপনার চোখের সামনে পড়ল। প্রথমে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। পরে যদি

এমন আরো হয়, তখন এই দৃশ্যটা আপনার মনে গেঁথে যাবে। ফলে অন্য সময় রোজা রাখা অবস্থায়ও ওই দৃশ্যটা আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে।এসব কুদৃষ্টি এতটাই ভয়ঙ্কর যে,আপনি রোজা অবস্থায় আপনার রবের সামনে সিজদায় যাবেন, তখনও শয়তান এসব দৃশ্য আপনার চোখে ভাসিয়ে তুলবে। রমজান মাসে মোবাইল দিয়ে তিলাওয়াতেও সর্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন করা উচিত।

মোটকথা রমজান মাসে শয়তান যেন কোনভাবেই আপনাকে ধোঁকা না দিতে পারে সেদিকে সতর্ক থাকা।ধোকার সমস্ত পথ আগেই বন্ধ করে দেয়া। ধোঁকায় পড়ে বাঁচার চেষ্টা করার চেয়ে আগেই ধোঁকার সম্ভাবনা দূর করা ভালো।

হজ ও উমরা-সংক্রান্ত ধোঁকা

ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভ হল বায়তুল্লাহর হজ্জ।গুরুত্বের ভিত্তিতে ঈমান,নামাজ, যাকাত ও রোজার পরই হজের অবস্থান। মূলত, হজে শারীরিক ও আর্থিক উভয় দিকই জড়িত।

উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে সক্ষম একজন মুসলমানকে তাই একটি সমন্বিত ইবাদতের অংশ হিসেবে হজ করতে হবে।অর্থাৎ

হজ আদায় সক্ষম এমন, শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি নিত্য প্রয়োজনীয় খরচাপাতি ও আসবাবপত্রের অতিরিক্ত হজে আসা-যাওয়ার ব্যয় এবং হজ আদায়কালীন সাংসারিক ব্যয় নির্বাহে সক্ষম এমন সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ আদায় করা ফরজ। জীবনে অন্তত একবার হজ করা আবশ্যক। বাধ্যতামূলক হজ সম্পন্ন করার পর ভবিষ্যতের যেকোনো হজ অতিরিক্ত অর্থাৎ নফল হিসেবে বিবেচিত হয়।

হজ যেহেতু জীবনে একবারই ফরজ তাই যার উপর হজ ফরজ সে মৃত্যুর আগে একবার আদায় করলেই হবে। দাবি হলো হজ ফরজ হওয়ার পর সাথে সাথে তা আদায় করে নেয়া। কারণ ভবিষ্যতের কথা তো বলা যায় না!যেকোনো সময় অসুখ-বিসুখ, বিপদাপদ,আর্থিক বিপর্যয় বা মৃত্যুর ডাক এসে যেতে পারে।তাই সামর্থ্য থাকা অবস্থায় হজ বিলম্ব করে পরে সামর্থ্য হারিয়ে ফেললে বা মৃত্যুবরণ করলে আল্লাহ তায়ালার সামনে ফরজ বিধান ত্যাগকারী অপরাধী হিসেবেই দণ্ডায়মান হতে হবে ।

আমাদের সমাজে অনেক ধনী লোক আছে যারা যুবক বয়সে অঢেল সম্পত্তির মালিক থাকা সত্ত্বেও হজ আদায় করেন না। তারা ভাবেন, এখনো তো দুনিয়াবি ব্যস্ততা প্রচুর।এর চেয়ে বরং ভালো হয় বৃদ্ধ বয়সে যখন অবসরে যাব তখন হজ আদায় করে নেব। এতে একই সাথে পুরো যৌবনকালে যত গুনাহ করব সব তো মাফ হয়ে যাবে। আচ্ছা,মানুষ কি জানে বা গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারে যে সে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত বাঁচবে?

আর যৌবন কালের ইবাদত আর বৃদ্ধকালের ইবাদতের তো এক না।বৃদ্ধকালে বয়সের ভারে অনেক হজের রোকন ঠিকমতো আদায়ই করা যায় না। কখনো অন্যের সাহায্য নিয়ে কোনো রকম আদায় করা যায়। আবার, অনেক অসুস্থ বৃদ্ধ বিছানা বন্দী হয়ে পড়লে অন্য কাউকে দিয়ে বদলি হজ আদায় করায়।

অনেক ধনী লোক যৌবন কালে ব্যবসায়িক সফরে বা বিভিন্ন ট্যুরে বিদেশে যাওয়া আসা করেন নিত্যদিন;কিন্তু হজ আদায় করার সুযোগ তাদের হয় না। হবেই বা কিভাবে!শয়তান তো তাদের ধোঁকা দিয়ে রেখেছে, বৃদ্ধ বয়সে হজ আদায় করলেই হবে। কিন্তু বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত সে বেঁচে থাকবে, এই গ্যারান্টি তাকে কে দিল?

অনেক দ্বীনদার ব্যক্তিও এই ধোকায় পড়ে আছেন। লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিদেশে দাওয়াতি সফর করতে পারলেও হজের ফরজ বিধান আদায়ে গড়িমসি করেন। জানতে চাইলে বলেন, আমি মানুষকে দাওয়াত দিতে গিয়ে ব্যস্ততার কারণে যদি হজ আদায় করতে নাও পারি, তাহলে আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেবেন।কারণ, আমি উম্মত নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। এ কথাগুলো খুবই ভয়াবহ। এটি নেক সুরতে শয়তানের মারাত্মক ধোঁকা। শয়তান নেক বান্দাদের তো স্পষ্টভাবে গুনাহের কাজে লিপ্ত করতে পারে না। তাই নেক সুরতে গুনাহে লিপ্ত করে দেয়।আর এই শয়তানের ধোঁকাটা স্পষ্ট গুণাহে লিপ্ত হওয়ার চেয়েও মারাত্মক। যে অলসতাবশত হজ আদায়ে বিলম্ব করছে, সেখানে তা স্পষ্ট অপরাধ।কখনো কখনো ওই ব্যক্তিও বুঝতে পারে, এটা অন্যায় হচ্ছে। কিন্তু যে সমস্ত দ্বীনদার ব্যক্তি দ্বীনের কাজের অজুহাতে বিলম্ব করছে, তাদের চোখে এ অপরাধ সহজে ধরা পড়ে না;বরং তারা ভাবে আমার কাজটি ঠিক হচ্ছে. ফলে এই ভুল থেকে শুধরানোর সুযোগ থাকে খুব কম। সুতরাং এটা স্পষ্ট কথা যখন হজ ফরজ হবে তখন হজ আদায়ে বিলম্ব করে বিদেশ সফর করা বা অন্য কোন দ্বীনি কাজ করা জায়েজ হবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الۡبَيۡتِ مَنِ اسۡتَطَاعَ اِلَيۡهِ سَبِيۡلًا ؕ وَمَنۡ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ عَنِ الۡعٰلَمِيۡنَ

'সমর্থ্যবান মানুষের উপর আল্লাহর জন্য বাইতুল্লাহর হজ্জ করা ফরজ আর যে অস্বীকার করে,তবে আল্লাহ তো নিশ্চয়ই সৃষ্টি কুল থেকে অমুখাপেক্ষী।'' (সূরা আল ইমরান, ৯৭)
ইবনু আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহ

مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ

যে ব্যক্তি হজ করার ইচ্ছা করে, সে যেন তাড়াতাড়ি তা আদায় করে নেয়।কারণ, যেকোন সময় অসুস্থ হয়ে যেতে পারে বা সফরে প্রয়োজন এমন কিছু হাতছাড়া হয়ে যেতে পার (যেমন

বাহনের ব্যবস্থা নাও থাকতে পারে) অথবা অন্য কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। (মুসনাদু আহমেদ, ১৮৩৩; ইবনে মাজাহ;২৮৮৩, হাসান)

হজ্বে যাওয়ার আগেই এ ব্যাপারে মজবুত সিদ্ধান্ত নেয়া চাই, হজের এ কয়দিন যে যা-ই করুক, আমি আখলাকের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করব। যে যা-ই বলুক,আমি শুধু সবর করব। যদি কেউ আমাকে কষ্ট দিয়েই ফেলে, আমি এতে ক্ষিপ্ত হব না; বরং ভাবব, সেও তো এখানে আল্লাহ তাআলার মেহমান হয়ে এসেছে। হতে পারে তার এ হজ আল্লাহ তাআলা কবুল করে নিয়েছেন। সুতরাং তার প্রতি আমার সম্মান ও শ্রদ্ধা আরও বেশি রাখা চাই।

এসব সফরে প্রতিনিয়ত ঘটা একটা মারাত্মক গুনাহ হলো, হজের মুআল্লিম বা এজেন্সির লোকদের গালিগালাজ করা। হ্যাঁ, এ কথা অনস্বীকার্য, অসংখ্য হাজী সাহেব তাদের কষ্টের টাকায় হজ বা উমরায় যাওয়ার পর এজেন্সির ধোঁকার কারণে প্রচুর কষ্টের সম্মুখীন হন। কিন্তু কষ্ট যেহেতু হচ্ছেই, তাই কয়েকটা দিন সবর করাই উত্তম। কেউ কেউ ইহরাম অবস্থায়,এমনকি হজের বিধানগুলো পালন করা অবস্থায় এজেন্সির লোকদের উদ্দেশে প্রচুর গালিগালাজ করে মনের জ্বালা মেটান। এতে করে তো সেসব কষ্ট দূর হচ্ছে না, উল্টো নিজের হজ আমি নিজেই নষ্ট করে দিচ্ছি। এ জন্য হজ-উমরায় যাওয়ার পূর্বে এজেন্সি সম্পর্কে যথাসম্ভব সব ধরনের খোঁজখবর নেয়া জরুরি। এ ক্ষেত্রে আরেকটি পরামর্শ থাকবে, থাকলে ভালো প্যাকেজেই হজ-উমরায় যাওয়ার চেষ্টা করা, তাহলে কষ্ট কম হবে সামর্থ্য।

গীবত ইহরাম অবস্থায় করা একটি মারাত্মক গুনাহ।মূলত এই গুনাহে এত বেশি লিপ্ত হওয়ার একটি অন্যতম কারণ হলো গীবতের পরিচয় না জানা। কাউকে যদি বলা হয় এটা গীবত হচ্ছে, তাহলে সে যুক্তি দেখাবে, নাহ, আমি তো সত্যি বলছি, মিথ্যা তো বলছি না। অথবা বলে,আমি তো তার সংশোধন বা অপরকে সতর্ক করার জন্য এসব বলছি, এটা জায়েজ; গীবত না। কারণ, সংশোধন বা সতর্ক করবে ওই ব্যক্তি যে আসলেই এর যোগ্য। এজন্য উচিত হলো, এ দুটির কোনটার নিয়তেই গীবত না করা। সংশোধন বা সতর্ক করার সবচেয়ে বেশি যোগ্য, যার সমালোচনা করা হয়েছে তার অভিভাবক বা মুরুব্বিগণ অথবা ওই ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট ওলামায়ে কেরাম। তারা কুরআন হাদিসের আলোকে বিষয়টি সমাধান করে দেবেন।

হজের সময় একটি মারাত্মক ফিতনা হলো অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল। এমনিতেই মোবাইল আমাদের অসংখ্য গুনাহে জড়িয়ে পড়ার অন্যতম কারণ। আবার যদি এটা হজ বা ওমরার সফরে নিয়ে

যাওয়া হয় এবং এর কারণে যদি কোন গুনাহে জড়িয়ে পড়তে হয়, তাহলে এটা আরো মারাত্মক। মোবাইল নিলেও ইহরাম বাধা অবস্থায় যাতে কোনভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করা না হয় এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই। এত কষ্টের সফর, এত দামি ইবাদত,এত দামি মুহূর্তগুলো যদি এক নিমেষের গুনাহের কারণে নিঃশেষ হয়ে যায় তাহলে এর চেয়ে আফসোসের আর কিছুই নেই।

হজ ও উমরার সফরে একটি মারাত্মক ধোঁকা হল ছবি তোলার মহড়া। এ যেন ওহী প্রাপ্ত বিধান। এসব সফরে ছবি ভিডিওর মাধ্যমে সফরকে স্মৃতিময় করে রাখতে হবে। কাবা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অযথা সেলফির অভ্যাস দিন দিন বেড়েই চলছে। আল্লাহতালার ঘর যখন তারচোখে পড়বে, তখন তো তার কোন হুঁশই থাকার কথা না। এমনকি এই ফিতনা থেকে রেহাই পায়নি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মোবারকও! রওজা জিয়ারতের সময়ও শান্তশিষ্ট ভাবে দুরুদ ও সালাম পড়ার পরিবর্তে বহু মানুষ এখন মোবাইল দিয়ে ভিডিও ও ছবি তোলা শুরু করে দেয়।অথচ রওজার ছবি তো দিলে ধারণ করার কথা, ক্যামেরায় নয়।

যাকাত-সংক্রান্ত শয়তানের ধোঁকা

ইসলামের অন্যতম একটি স্তম্ভ ও ফরজ বিধান হলো যাকাত। যাকাত ফরজ হওয়ার ব্যাপারে উম্মাহর সকল উলামায়ে কেরাম একমত। যাকাত ফরজ করা হয়েছে ধনীদের সম্পদ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণে অল্পকিছু সম্পদ নিয়ে গরিবদের
মাঝে বণ্টন করার জন্য। এতে ধনীদের বাকি সম্পদ পবিত্র থাকবে। আর গরিবরা তাদের অভাব মোচন করতে পারবে, স্বাবলম্বী হতে পারবে। কিন্তু ধনীদের অনেকেই যাকাতকে আর্থিকদণ্ড মনে করে।অথচ কুরআনুল কারীমে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট সতর্কবার্তা এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

وَ مِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَ يَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَ اللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

‘আর এই গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে তা জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের জন্য দুর্দিনের প্রতীক্ষায়
থাকে; দুর্বিপাক তাদের ওপরই এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।’(সূরা তাওবা,১৮)

শয়তান যাকাত বিষয়ে মুমিন মুসলমানকে ধোঁকা দিয়ে গাফেল করে রাখে। ফলে যাকাতের নেসাব এক বছর পেরিয়ে বহুদিন চলে গেলেও যাকাত আদায়ের কোনো খবর থাকে না। এমনকি কেউ কেউ কয়েক বছর পর্যন্ত যাকাত আদায় করে না।

আমাদের অনেকের কর্মপদ্ধতি থেকে মনে হয়, যাকাত যেন রমজান মাসেই আদায় করতে হয়। অথচ বিষয়টি এমন নয়। যাকাতের নেসাব এক বছর পূর্ণ হয়ে গেলে তখনই যাকাত ফরজ হয়ে যায়। হ্যাঁ, তখন রমজান কাছাকাছি থাকলে

রমজান পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়। এ বিষয়ে শায়খুল ইসলাম তাকী উসমানী হাফি.

বলেন, 'সাধারণত মানুষ পবিত্র রমজান মাসে যাকাত প্রদান করে থাকে। যার কারণ হচ্ছে, পবিত্র রমজান খুবই মুবারক ও বরকতপূর্ণ, তাই রমজানে যেকোনো আমলের সওয়াব বেশি পাওয়া যায়। কাজেই যাকাতও যেহেতু ফরজ,অতএব তা রমজানে আদায় করা হলে তার সওয়াবও বেশি পাওয়া যাবে। এ কথাটি স্বস্থানে সম্পূর্ণ সঠিক এবং এ আগ্রহও প্রশংসনীয়। কিন্তু যদি কারও 'সাহেবে নেসাব'। হওয়ার তারিখ জানা থাকে, তবে শুধু ওই সওয়াবের লক্ষ্যে সে ব্যক্তি রমজানকে যাকাত প্রদানের তারিখ হিসেবে নির্ধারণ করতে পারে না; বরং তার করণীয় হচ্ছে,'সাহেবে নেসাব' হওয়ার তারিখেই নিজ যাকাতের হিসাব করা। অবশ্য যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে এ পন্থাটি অবলম্বন করতে পারে যে, অল্প অল্প করে যাকাত

আদায় করতে থাকবে। অবশিষ্ট যা থাকবে সেটা পবিত্র রমজান মাসে আদায় করবে। তবে হ্যাঁ, যদি তারিখ মনে না থাকে, তাহলে তার জন্য পবিত্র রমজানের যেকোনো তারিখ নির্ধারণ করার অবকাশ আছে। অবশ্য সতর্কতার খাতিরে কিছু

বেশি আদায় করবে, যাতে তারিখ অগ্র-পশ্চাৎ করার দরুন যদি কোনো তারতম্য দেখা দেয় সেটাও পুরা হয়ে যায়। অতঃপর একবার যে তারিখ নির্ধারণ করবে, পরবর্তী সময়ে প্রতিবছর ওই নির্দিষ্ট তারিখেই নিজ যাকাতের হিসাব করবে। আর দেখবে যে, এ তারিখে আমার কী কী মূলধন আছে। ওই তারিখে নগদ টাকাই-

বা কত আছে। যদি স্বর্ণ-রৌপ্য বিদ্যমান থাকে, তাহলে ওই তারিখেরই রৌপ্য ও স্বর্ণের মূল্য (বিক্রয়মূল্য উদ্দেশ্য, ক্রয়মূল্য নয়) দেখবে। শেয়ার থাকলে সেই তারিখের শেয়ারের মূল্য দেখবে, স্টকের মূল্য লাগাতে চাইলে ওই তারিখেরই

স্টকের মূল্য লাগাতে হবে। আর পরবর্তী প্রতিবছর ওই তারিখেই হিসাব করে

যাকাত আদায় করা উচিত। সেই তারিখের আগে-পিছে করা অনুচিত।'(আহকামে যাকাত, মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী ও মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী, পৃষ্ঠা ৯০ (ঈষৎ সংক্ষেপিত))

অনেক ব্যক্তি যাকাতের পরিমাণ হিসাব না করে ধারণা করে কিছু পরিমাণ যাকাত দিয়ে দেন। যদি যাকাতের একটি পয়সাও অনাদায়ী থাকে, তাহলে যাকাত পূর্ণরূপে আদায় হলো না। এখন

অনেকেই অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে যাকাত দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সতর্কতা হলো, যাকাত যদি দেয়া হয় উদাহরণস্বরূপ ১০ হাজার, তাহলে অবশ্যই পাঠানোর খরচ-সহ দিতে হবে, নাহয় এই ১০ হাজার থেকে খরচ অটোমেটিক কাটার ফলে মূল যাকাত থেকেই কম হয়ে যাবে। এতে যাকাত পরিপূর্ণ আদায় হবে না। তাই মূল যাকাতের সাথে অনলাইন খরচ দিয়ে দেয়া জরুরি।

যাকাতের হিসাব ভালোভাবে না করার কারণেও অনেকের যাকাত পরিপূর্ণভাবে আদায় হয় না। যাকাতের হিসাব অনুমান করে হিসাব না করে পরিপূর্ণভাবে করতে হবে। এখন তো অনলাইনে 'যাকাত ক্যালকুলেটর' নামে অনেক সাইট
পাওয়া যায়। সেখানে সমুদয় সম্পদের হিসাব লিখলে যাকাতযোগ্য সম্পদের হিসাব বেরিয়ে আসে। অথবা কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করলেও ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়।

এমন অনেক লোকও আছে, যারা যাকাতের নামে নিজের সম্পদের শোডাউন করে বেড়ান। তারা মনে করেন, যারা যাকাত নেবে তাদের ওপর আমি অনুগ্রহ করছি। অথচ তারা যাকাত নিয়ে মূলত যাকাত প্রদানকারীর ওপরেই ইহসান করছে। তার সম্পদকে পবিত্র করার সুযোগ করে দিচ্ছে।

কিন্তু এখন যাকাত আদায়ের নামে উল্টো মানুষকে পেরেশান ও অপদস্থ করা হয়।
খুব কমদামি কিছু শাড়ি-লুঙ্গি এনে বাসার সামনে যাকাতপ্রার্থী লোকদের ভিড় জমিয়ে সেগুলো দেয়া হয়। এতে সমস্যা হয় কয়েক ধরনের। প্রথমত, এখানে যারা এসেছে, সবাই যাকাতের উপযুক্ত কি না সেটা যাচাইয়ের সুযোগ থাকে না।
আর যাকাতের অনুপযুক্ত কাউকে যাকাত দিলে যাকাত আদায় হয় না। দ্বিতীয়ত, এসব ভিড়ের কারণে প্রায় প্রত্যেক বছরই অনেক লোক আহত হয়। এমনকি কখনো কখনো নিহত হবার সংবাদও পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো,
এভাবে যাকাত দেয়ার কারণে নিজের ভেতর অহংকার চলে আসে এবং লোক-দেখানোর আশঙ্কাও এতে প্রবল থাকে। তাই যাকাত দেয়ার উত্তম পদ্ধতি হলো, যাচাই-বাছাই করে প্রথমে যাকাতের উপযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করা।
এরপর নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত সম্ভব হলে নিজে গিয়ে তার হাতে তুলে দেবে।অথবা অন্য কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তির মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছাবে।

যাকাত নগদ টাকার মাধ্যমেই আদায় করা উত্তম। যেন যাকাতগ্রহীতা নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী তা ব্যয় করতে পারে। গ্রহীতার প্রয়োজন বিবেচনা না করে ঢালাওভাবে শাড়ি-কাপড় ইত্যাদি দ্বারা যাকাত আদায়ের প্রচলনটি ঠিক নয়।

এতে কখনো এমন হয় যে, এক গরিব একাধিক কাপড় পায় অথচ তার চাল-ডাল বা অন্য কিছুর প্রয়োজন। ফলে সে তার কাপড়টি অল্পমূল্যে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এতে করে প্রকৃত অর্থে গরিব পুরো টাকাটা পায় না। অবশ্য কেউ যদি

যাকাতের টাকা দ্বারা কাপড় কিনে গরিবদের দেয়, তাতেও যাকাত আদায় হয়ে যাবে। তবে কাপড় বা যে জিনিসই দেওয়া হোক এক্ষেত্রে গ্রহীতার কী ধরনের জিনিস প্রয়োজন সে বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখা উচিত। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, বর্ণনা ১০৫৩৯; কিতাবুল আছল ২/১০৪; বাদায়েউস সানায়ে

২/১৪৬; আলবাহরুর রায়েক ২/২২১; ফাতহুল কাদীর ২/১৪৫)

কেউ কেউ অল্প পরিমাণে যাকাতের টাকা বণ্টন না করে কোনো এক বা একাধিক দরিদ্র ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করার জন্য মোটা অংকের টাকা দেওয়া পছন্দ করে। আবার কেউ ঘর বা দোকান ইত্যাদি নির্মাণের খরচেও যাকাতের বড় অংকের

টাকা দিয়ে থাকে। এভাবেও যাকাত আদায় হয়ে যায়। তবে এ ক্ষেত্রে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে একত্রে অনেক টাকা না দিয়ে তার প্রয়োজনীয় মালামাল কিনে দেওয়া উচিত। যেন সাথে সাথেই সে যাকাতের নেসাবের মালিক না হয়ে যায়

এবং তার প্রয়োজনও পুরো হয়। যদিও একজনকে যাকাতের এত অধিক টাকা দেওয়া সাধারণত মাকরূহ। আর এ ধারাটি খুব ব্যাপক হওয়া উচিত নয়। কারণ যে দেশে যাকাত গ্রহণকারী দরিদ্রের সংখ্যা অনেক বেশি সেখানে অল্প কিছু লোককে যাকাতের বড় অংকের টাকা দিয়ে দিলে অন্যদের বঞ্চিত হওয়ার

আশঙ্কা সৃষ্টি হয়।(মাসিক আলকাউসার, জুন-জুলাই ২০২৪)

উলামায়ে কেরামকে শয়তানের ধোঁকা:

কুরআন-হাদীসের ইলম থাকায় শয়তান সাধারণত উলামায়ে কেরামকে ধোঁকা দিতে পারে না।কিন্তু কেউ যদি একবার ধোঁকায় পড়ে যায়,

তাহলে তার গোমরাহীর পরিমাণও অনেক মারাত্মক হয়। সাধারণ একটি রিকশা

বা সাইকেল দুর্ঘটনায় পড়লে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয় না; কিন্তু বিমান বা বড় জাহাজ যদি দুর্ঘটনায় পড়ে, তাহলে এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেশি হয়।

সদ্য ফারেগ উলামায়ে কেরামের কেউ কেউ হতাশায় ভোগেন। আর এই হতাশা তার ভেতরে বহুদিন আগ থেকেই ছিল। আলেম হয়ে আর কত টাকা কামাতে পারব? কোনো সরকারি চাকরি তো করতে পারব না। বংশের সবাই উচ্চশিক্ষিত,
আমিই কেবল মাদরাসার হুজুর হলাম, সবার সাথে তো আমি মিশতেও পারব না ইত্যাদি নানা হতাশায় তারা ভোগেন। এটা মূলত শয়তানের মারাত্মক একটি ধোঁকা। একজন আলেমের এটা জানা থাকা উচিত, দুনিয়ার কেউই যদি তাকে দাম
না দেয়, দুনিয়ার কোথাও যদি সে সম্মান না পায়, তবুও আল্লাহ তাআলার কাছে তার দাম সবচেয়ে বেশি।

তখন আবু দারদা রাযি. বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য
কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মাধ্যমে তাকে জান্নাতের পথসমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম তলবকারীর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের ডানাসমূহ বিছিয়ে দেন। নিশ্চয়ই যারা আলেম, তাদের জন্য আসমান ও জমিনে যারা আছে তারা আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে থাকে, এমনকি মাছসমূহ পানির মধ্যে থেকেও। আলেমগণের মর্যাদা আবেদগণের ওপরে ওইরূপ, পূর্ণিমার রাতে চাঁদের মর্যাদা অন্যান্য তারকাসমূহের ওপরে যেরূপ।নিশ্চয়ই আলেমগণ হলেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ কোনো দীনার বা দিরহাম উত্তরাধিকার হিসেবে রেখে যান না; বরং তারা রেখে যান কেবল ইলম। অতএব যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করেছে, সে ব্যক্তি পূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে। (সুনানু আবী দাউদ, ৩৬৪১; জামে' তিরমিযী, ২৬৮২; সুনানু ইবনি মাজাহ,২২২৩, হাদিস সহীহ)

শয়তান জানে, আলেমদেরকে সাধারণত সে সরাসরি কোন বড় কোনায় লিপ্ত করতে পারবে না। আর সেটাও জানে, সমাজের উপর তার এখন বড় প্রভাব রয়েছে। আলেমের একটি কথার কারণে, একটু দাওয়াতের কারণে অনেক গুনাহের মজলিস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। অসংখ্য লোক গুনাহের পর থেকে ফিরে আসতে পারে। তাই শয়তান চেষ্টা করে কীভাবে সমাজের চোখে তাকে খারাপ বানানো যায়, কীভাবে প্রভাব নষ্ট করা যায়।শয়তানি কাজ করতে অনেকগুলো পদ্ধতি অবলম্বন করে। কাউকে সে অনর্থক কাজে লিপ্ত করে দেয়। ফলে কোন কোন তরুণ আলেম নিজ
এলাকায় আড্ডাবাজি, খেল-তামাশায় ব্যস্ত থাকেন। এ কারণে সাধারণ মানুষের মন থেকে তার প্রভাব উঠতে শুরু করে। পরবর্তী সময়ে কোন খারাপ কাজে বাধা দিলেও তেমন গুরুত্ব দেয়া হয় না।

এজন্য উলামায়ে কেরামের উচিত নিজ এলাকায় প্রকাশ্যে আড্ডা, খেল -তামাশায় লিপ্ত না থাকা।

পর্দার ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ে সচেতন থাকা। ছোটবেলা থেকে পরিচিত থাকার কারণে মহল্লার ভাবি বা দূর- সম্পর্কের খালার সাথে বেপর্দায় কথা না বলা।এটা তো এমনিতেই হারাম। আবার এসব কাজের কারণে সমাজের চোখে মানহীন হয়ে যেতে হয়। ফলে কথার কোন গুরুত্ব থাকেনা।

এছাড়া আলেমের সাথে মানায় না এমন কোন পোশাক,বখাটেদের মত স্টাইল,মাথার চুল এসব ব্যাপারে খেয়াল রাখা চাই।আজকাল কোন কোন আলেমকে দেখা যায় পথের মধ্যে কানে হেডফোন বা ব্লুটুথ লাগিয়ে হাঁটছেন। এসব ব্যবহার করা গোনাহের কিছু নয়। তিনি হয়তো তিলাওয়াত, নাশীদ শুনছেন বা কারো বয়ান শুনছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ সবকিছুকে নিজেদের সাথে মেলায় বলে মনে করতে পারে যে এটা গুনাহের কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই তাদের সন্দেহের চোখে দেখলে খুব বেশি দোষ দেয়া যায় না। মানুষ সন্দেহের চোখে দেখো কেমন কাছ থেকে বিরত থাকাই উত্তম। মনে রাখতে হবে মানুষের অন্তরে জায়গা নেওয়ার পূর্ব শর্ত হলো তাদের অন্তরে আগে নিজেকে ‘সাদা’ হিসেবে পেশ করতে হবে।

যেকোনো সভা-মজলিসে যাওয়ার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে তার অগোচরে কোন শরীয়ত-বিরোধী কাজ সমর্থন পেয়ে না যায়।এমনকি কোন মহল্লার কোন হোটেলে বা চায়ের দোকানে বসতে বলে তার ব্যাপারে না জেনে বসে পড়বে না। কারণ, হতে পারে লোকটি অসৎ, আর তার সাথে তোমার এই সামান্য সময় বসে চা খাওয়া গল্প করাকে কাজে লাগিয়ে এসে তার অসৎকর্মের সার্টিফিকেট বানিয়ে ফেলবে। সে তখন সবাইকে বলে বেড়াবে ওমুক আলেমের সাথে আমার সম্পর্ক ভালো। মানুষ তখন তার কথা শুনে ধোঁকা খেয়ে বসবে।

ক. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আলেমদের সতর্কতা

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আলেমদের সতর্ক থাকা চাই ব্যবসা-বাণিজ্যে শরীক নেয়া বা শরীক থাকার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামকে পূর্ণ সতর্ক থাকা চাই। এই কাজে অসতর্কতার দরুন অনেক আলেম এখন অপমানের গ্লানি বয়ে বেড়াচ্ছেন। লোকলজ্জায় পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। পরিবারের কাছেও মুখ দেখাতে পারছেন না। তাই আর্থিক লেনদেন-বিষয়ক কোনো প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার পূর্বে অবশ্য অবশ্য অভিজ্ঞজনদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। কারণ, কদিন পরেই যখন সেই প্রতিষ্ঠান বা সেই লোক সবকিছু নিয়ে চম্পট দেয়, তখন এ সবকিছুর দায়ভার ওই সকল আলেমদেরকেই বহন করতে হয়, যাদেরকে দেখে সাধারণ মানুষ উক্ত প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হয়েছিল। অবশ্য ততক্ষণে তো এই আলেমের সব সম্বল শেষ। এবং এই আলেম যাদের কাছ থেকে

পুঁজি এনে দিয়েছিল তাদেরটাও শেষ। একপর্যায়ে ওই আলেমকে পলায়ন করতে হয়। এছাড়া ব্যবসার ক্ষেত্রেও শরীক নেয়ার ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত। অপরিচিত কাউকে শরীক রাখা উচিত না। এসব ব্যাপারে শয়তান খুব সূক্ষ্মভাবে ধোঁকা দেয়।
কিন্তু এর ফলাফল হয় অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও মানহানিকর।

খ. কোনো প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং করার ক্ষেত্রে সতর্কতা

আর্থিক কোনো প্রতিষ্ঠান বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হওয়া,তাদের মার্কেটিং করা, তাদেরকে প্রোমোট করা বা তাদের শরয়ী দিক দেখার দায়িত্ব নেয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত পর্যায়ের সতর্ক হওয়া জরুরি। কোনো আলেম কোনো প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং করলেন, তাদের কথা প্রচার করলেন; কিন্তু পরে দেখা গেল, তাদের কার্যকলাপে শরীয়া-বিরোধী কাজ রয়েছে। তখন সাধারণ মানুষ ধোঁকায় পড়ে যাবে।

এমনইভাবে কোনো বই প্রচারের ক্ষেত্রেও সতর্কতা জরুরি। এমন বই-এমন লেখককে প্রচার করা যাবে না, যার দ্বারা মানুষ দ্বীনের ব্যাপারে ধোঁকায় পড়ার শঙ্কা রয়েছে। অনেকেই সাহিত্যমান প্রচার করতে গিয়ে বিভিন্ন নাস্তিকদের বইয়ের প্রচার করে থাকেন। অথচ তার এই প্রচারের পর কোনো সাধারণ লোক সেই বই পড়তে গিয়ে যদি দ্বীনের ব্যাপারে সামান্যও সন্দিহান হয়ে যান, তাহলে
এর দায় কে নেবে?

গ.হাসি-ঠাট্টায় সতর্কতা অবলম্বন করা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় মুখ গোমড়া করে রাখতেন তা নয়; তিনিও মাঝে মাঝে শরয়ী সীমার মধ্যে থেকে হাসতেন। কিন্তু হাস্যরস করতে গিয়ে কাউকে ঠাট্টা করা, ছোট করা, মিথ্যা বলে কৌতুক করা নাজায়েয। রাসূল
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'ওই ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তার জন্য।'
(সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৪৯৯০; জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩১৫, হাসান)

ঘ. দরিদ্রতার ধোঁকা

জীবনে যে পরিস্থিতিই আসুক, সর্বাবস্থায়ই হালাল-হারাম বিবেচনা করে চলতে হবে। নিজের ইলমের মান রক্ষা করে চলতে হবে। এমন কোনো কাজ করা যাবে না, যা নিজের ইলমের জন্য মানহানিকর। আর দারিদ্র্য থেকে মুক্তির জন্য বেশি বেশি দুআ করা উচিত।

সদ্য ফারেগীন কোনো কোনো আলেম কিছুদিন পরেই যেন হারিয়ে যান চোখের আড়ালে। কেউ-বা পা বাড়ান ভুল পথে। এসব তরুণ দাওরা-পড়ুয়াদের বিপথগামিতার মূল কারণ হচ্ছে গোড়া, অর্থাৎ নিজ উস্তাদদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ।

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক হাফিজাহুল্লাহ বলেন,

'বর্তমানে দাওরা পড়ুয়া যে মৌলবীগণ জুমহুর উলামায়ে কেরাম এবং নিজেদের উস্তাদদের থেকে আলাদা হয়ে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন মতবাদ গ্রহণ করেছেন, তাদের মূল সমস্যা এটাই যে, তাদের ইলম আমল অথবা চিন্তা-চেতনার কোথাও ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে, যার মন্দ প্রভাব এইভাবে প্রকাশিত হয়েছে।[৩]

তারা তাদের উস্তাদদের থেকে ইলম যথাযথভাবে হাসিল করেননি এবং তাদের তরবিয়ত সঠিকভাবে গ্রহণ করেননি। সেজন্য তাদের ইলমে সামগ্রিকতা ও পরিপক্কতা হাসিল হয়নি এবং উস্তাদের সোহবত ও তরবিয়তের দ্বারা তাদের

চিন্তা-চেতনা ও রুচি-প্রকৃতির যে পরিশুদ্ধি দরকার ছিল সেটা অর্জিত হয়নি। তাদের প্রতি বান্দার ইনতেহায়ী দরদমান্দানা ও নাসেহানা গুযারিশ, আপনারা আপনাদের উস্তাদদের শরণাপন্ন হয়ে পুনরায় নিজেদের ইলম, ফাহম ও ফিকিরের জায়েযা নিন। এগুলো পরিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত করুন। কেননা এগুলো মৌলিক

বিষয়। এগুলোর কোনোটিতে যদি ত্রুটি, অসম্পূর্ণতা বা বক্রতা থাকে, এর প্রভাব

জীবনের বহু ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে। আল্লাহ তাআলাই একমাত্র রক্ষাকারী। (মাসিক আলকাউসার, সেপ্টেম্বর ২০২২)

এ জন্য দাওরার পর উস্তাদদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। বছরে দুয়েকবার হলেও উস্তাদদের সোহবতে যাওয়া-আসা করতে হবে। যেকোনো একজন তালীমী মুরুব্বির অধীন থেকে ইলমি বিষয়গুলো সমাধান করতে হবে। এ সময়টাতে শয়তানের বড় একটি ধোঁকা হলো, নিজের ইলমের পরিপক্কতা আসার আগেই উস্তাদতুল্য আলেমদের ভুল ধরতে শুরু করা। তখন সদ্য ফারেগ হওয়ার কারণে ইলমের জযবা থাকে বেশি, কিন্তু তাহকীক বা গবেষণা থাকে কম। ফলে

মোটা ইলম দিয়ে সূক্ষ্ম ইলমের তাহকীক বোঝা মুশকিল হয়ে যায়। কেউ কেউ শুধু জাহেরী হুকুম দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন, অথচ দ্বীনের সব বিষয়ে জাহেরী ইবারাত দিয়ে ফতওয়া দেয়া যায় না। এ জন্য দীর্ঘ অধ্যবসায় ও সুদীর্ঘ
সোহবত ব্যতীত ইলমি বিষয়ে মুনাযারা-মুনাকাশা এবং তাহকীকী বিষয়গুলোতে নতুন গবেষণা শুরু করে দেয়া উচিত না।

তরুণ আলেমদের ওপর একটি মারাত্মক ধোঁকা হলো, 'আমরা কাউকে অন্ধ অনুসরণ করি না। আমরা আকাবির-পূজা করি না।' বাস্তবে কথাটি শতভাগ সত্য এবং এটাই আমাদের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু এই কথার ধোঁকায় পড়ে তরুণ
আলেমদের অনেকে পথ হারিয়ে ফেলেন। নিজের কাছে যাকে ভালো লাগে না, সেই আলেমকেই এই উসুল অনুযায়ী গোমরাহ বলে দেন। আবার অনেক ছাত্রও এই উসুল দেদারসে বলে বেড়ান! এই উসুল এখন ফ্যান্টাসির মতো হয়ে
গিয়েছে। এ বিষয়ে প্রথম কথা হলো, যদি কোনো আলেম থেকে স্পষ্ট ভুল কাজ প্রমাণিত হয়, তাহলে সেটা অবশ্যই প্রমাণিত। কিন্তু তার এই ভুল কাজের সমালোচনা-পর্যালোচনা করবেন তার মতোই বড় ব্যক্তিগণ। তরুণ আলেম বা
ছাত্ররা সমালোচনা করবে না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, কারও থেকে যদি এমন কাজ প্রকাশ পায়, যেটা সঠিক-ভুল উভয়েরই সম্ভাবনা রাখে, তাহলে সে কাজ তরুণ আলেম বা ছাত্ররা নিজেদের উসুল দিয়ে সঠিক বা ভুল নির্ধারণ করবে না; বরং এ ব্যাপারে অন্যান্য অনুসরণীয়
আলেমদের কথাকেই অনুসরণ করবে। তারা যদি এটাকে ভুল বলেন তাহলে বর্জন করতে হবে।
তবে নিজ ইলমের গভীরতা আসার আগ পর্যন্ত কোনো অনুসরণীয় আলেমকেই অনুসরণ করা উচিত। কেননা, ইলমের গভীরতা না থাকার কারণে বাহ্যিক ইলম দিয়ে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে দিলে গোমরাহ হওয়ার আশঙ্কাই প্রবল।
তবে একটা কথা মাথায় রাখা চাই, কারও থেকে সুস্পষ্ট শরীয়ত-বিরোধী এমন কাজ প্রকাশ পেল, যার ব্যাপারে বেশিরভাগ হক্কানী উলামায়ে কেরাম একমত যে, এটা বর্জনীয় কাজ, তাহলে সেটা অবশ্যই বর্জন করতে হবে। এবং এ কাজের
সমালোচনা করতে হলে আদাবুল ইখতিলাফ মেনেই করতে হবে। তবে তরুণদের মনে রাখতে হবে, সব বিষয়ে প্রতিবাদ ও সমালোচনা করা তার দায়িত্ব না; বরং বিষয়টি উপযুক্ত লোকদের জন্যই ছেড়ে দিতে হবে।

ঙ.বিতর্ক-কেন্দ্রিক শয়তানের ধোঁকা

বাতিলদের আস্ফালন রুখতে যুগে যুগে বিতর্কের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।আকাবির-আসলাফের অনেকেই এ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে। কিন্তু বহছ-বিতর্ক, খণ্ডন ইত্যাদিতে বেশি ব্যস্ত থাকার কারণে নিজের ভেতরে একধরনের ঘৃণ্য মনোভাব চলে আসে। অন্তর কঠোর হয়ে যায়। যেকোনো বিপক্ষকেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করে। বিপক্ষের সমস্ত কথাকেই তখন ঠুনকো মনে হয়। এবং নিজের ভুলগুলো তখন সামনে আসে না।

বিশেষত, আলেমদের এ ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত। তাদের এতদিনের সমস্ত অর্জন সামান্য একটা ভুলেই হালকা হয়ে যেতে পারে। বহছ-বিতর্ক বা ওয়াজ-মাহফিলে তাদের শব্দচয়ন হওয়া চাই মেপে মেপে। কথার নিক্তিতে সামান্য হেরফের হলেই ঘটে যেতে পারে লঙ্কাকাণ্ড। সাবধান থাকা চাই শয়তানের ধোঁকা থেকে। হুঁশিয়ার হওয়া চাই প্রতিটি পদক্ষেপে।

দিতে ব্যস্ত হয়ে নিজের আমল বৃদ্ধির কথা বেমালুম ভুলে যান। উম্মতের ফিকিরে ব্যস্ত রেখে শয়তান নিজের কথা ভুলিয়ে দেয়। এ জন্য সতর্ক থাকা চাই, দুনিয়াবি জৌলুস, সুনাম-সুখ্যাতি,প্রোগ্রাম, সফর ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যস্ততা যেন আমাকে আমার রব থেকে দূরে সরিয়ে না দেয়।

অনেকে বয়ান বা আলোচনার মধ্যে দুনিয়াবি এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন,
যে বিষয়ে তার জানাশোনা নেই। কোনো রকম ভাসাভাসা জ্ঞান দিয়ে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এতে যেমন তারও মানহানি হয়, সাধারণ শ্রোতাগণ তাকে ভিন্ন চোখে দেখা শুরু করেন, তেমনইভাবে এতে ইসলাম-বিদ্বেষীরা বিরোধিতা
করার সুযোগ পেয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

‘যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সে বিষয়ের পেছনে তুমি পোড়ো না। (সূরা ইসরা,৩৬)

এই নীতির কথা আমরা সবাই জানি, কোনো বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান না থাকলে, সে বিষয়ে কথা বলা নিষিদ্ধ; কিন্তু আমাদের আলোচনা ও নসীহার মজলিসে অনেকেরই বিষয়টি মনে থাকে না। কত লোক ব্যস্ততার কারণে দু-হাত তুলে একটু দুআ করার সুযোগ পায় না! কত মানুষ ব্যস্ততার ভিড়ে একটু ধীরে-সুস্থে নামাজ পড়ার তাওফীক পায় না! লম্বা লম্বা দুআর অভ্যাস যেন হারিয়ে গেছে বহু আগেই। অসংখ্য মানুষের ইসলাহের
ফিকির করনেওয়ালা নিজের ইসলাহের ব্যাপারে গাফেল হয়ে যায়। বয়ান করে হাজার হাজার শ্রোতার চোখ থেকে অশ্রু ঝরানেওয়ালা বক্তা খুব কমই দুআয় অশ্রু ঝরানোর সুযোগ

পায়।মানুষকে মোটিভেশনাল কথা বলে দিল নরম করনেওয়ালা ব্যক্তিও দিনশেষে রূঢ় থেকে যায়। এর কারণ কী? এর কারণ হলো ব্যস্ততা। নিজেকে নিয়ে একটু ভাবার সময়ের কমতি। আমাদের এ ব্যস্ততাগুলো যেন দিনশেষে আমাদেরই ক্ষতি টেনে

আনছে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আমরা ভাবছি, আমরা তো মানুষের কল্যাণেই নিয়োজিত আছি!

ফতোয়া প্রদানকারীদের কে শয়তানের ধোঁকা

ফতোয়া প্রদানকারীরা তো গুরুত্বপূর্ণ ফজিলত পূর্ণ দায়িত্ব বহন করেন। ইমাম নববী রহ.-এর ভাষায় ফতোয়া প্রদানকারী হলেন ফিকহের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সালামের ওয়ারিশ এবং তিনি একটি ফরজে কিফায়া দায়িত্ব পালন করছেন।

ফতোয়ার গুরুত্ব অনুধাবন করে ফতোয়া প্রদান করা ফতোয়া প্রদান কারীর জন্য আবশ্যক। ফতোয়া প্রদানকারী আবেগের বশীভূত হয়ে কোন মুবাহ কাজকে হারাম বলতে পারবেন নাহ, বা মাকরুহ কাজকে হারাম বলতে পারবেন নাহ,অথবা কোনো নাজায়েজ কি জায়েজ বলে ফতোয়া দিতে পারবেন না। এমনিভাবে ফতোয়া কোন যুক্তি নির্ভর বিষয়ে অথবা প্রবৃত্তির অনুসরণ নয় যে, যুক্তি অনুযায়ী যা মনে হল সেটাই ফতোয়া দেয়া হবে অথবা মন যেদিকে ঝুঁকে যায় সেদিকে ফতোয়ার মোড় ঘুরে যাবে ; বরং ফতোয়া হলো আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে যেসব শরয়ী বিধান প্রণয়ন করেছেন এর বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ফতোয়ার গুরুত্ব বুঝার জন্য এতোটুকুই যথেষ্ট যে ফতোয়া প্রদানকারী হলেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত।

পরিভাষা অনুযায়ী প্রকৃত মুফতী সাহেব হলেন, যিনি ফতওয়ার উসুলের আলোকে বিভিন্ন শাখাগত মাসআলা উদ্ঘাটনের যোগ্যতা রাখেন এবং প্রচুর জুযয়ী মাসআলা যার আয়ত্তে রয়েছে। নতুন কোনো সমস্যা সৃষ্টি হলে উসুল অনুযায়ী সেসব নব্য মাসআলার উত্তর দেয়ারও যোগ্যতা রাখেন। আর এই যোগ্যতা স্বাভাবিকভাবে শুধু ইফতা পড়লেই আসে না; বরং ইফতা পড়ার পরও একজন অভিজ্ঞ মুফতী সাহেবের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিন ফিকহ-ফতওয়ার অনুশীলন ও অধ্যবসায়ের পর এই যোগ্যতা ও রুচি ভেতরে আসে। এরপর কাজ করতে করতে এ যোগ্যতা আরও বৃদ্ধি পায়। সে হিসেবে একজন দক্ষ মুফতী হতে হলে পর্যাপ্ত বয়স,ফতওয়ার রুচি, দীর্ঘ সোহবত সবকিছুই লাগে। এর আগ পর্যন্ত কাউকেই মুফতী বলা উচিত না বরং তিনি ফতোয়ার কিতাব দেখে ফতোয়া নকল করবেন। নিজে থেকে কোন মাসালা উদঘাটন করার যোগ্যতা এখনো তার তৈরি হয়নি।

সদ্য ইফতা-পড়ুয়া আলেমদের কেউ কেউ নিজেকে মুফতী ভেবে কিছু ক্ষেত্রে ধোঁকায় পড়ে যান। যারা প্রকৃত মুফতী তাদের জন্যই কোনো বিষয়ে ফতোয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। এবং ফতোয়ার ক্ষেত্রে

তাড়াহুড়া করা একেবারেই উচিত নয়। কিন্তু সদ্য ইফতা-পড়ুয়া আলেমদের কেউ কেউ এ ব্যাপারে বেশ তাড়াহুড়া করেন। এমনকি কেউ কেউ নতুন কোনো বিষয়ে কিয়াস করাও শুরু করে দেন। অথচ তার কাজ হলো শুধু হুবহু কিতাবের

ফতোয়া নকল করা। ফতোয়া তো উচ্চ বিষয়, স্বাভাবিক কোনো মাসআলা বর্ণনা করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কারণ, তাড়াহুড়া করার কারণে যদি মাসআলায় কোনো ভুল হয়ে যায়, তাহলে এর দায়ভার ফতওয়া প্রদানকারীর ওপরই বর্তাবে। স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত ফতোয়া দেয়ার ক্ষেত্রে সাবধান
থাকতেন। একান্ত জরুরি না হলে ফতোয়া দিতেন না।

সুফয়ান ইবনু উয়াইনা রহ. বলেন, ফতোয়ার ব্যাপারে যে সবচেয়ে বেশি চুপ থাকে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। আর যে বেশি ফতোয়া দেয় সে সবচেয়ে অজ্ঞ। (শামসুদ্দীন মাকদিসী, আদাবুশ শরীআহ,২/৬৩)

কেউ কেউ চান যে, তার কাছে বেশি বেশি ফতোয়া আসুক বা তাকে মানুষ মুফতী
বলে ডাকুক। এটা শয়তানের সূক্ষ্ম একটি ধোঁকা। ফতওয়ার মতো গুরুদায়িত্ব চেয়ে নেয়া উচিত না।

সুফয়ান ইবনু উয়াইনা রহ. বলেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, মানুষ তাকে বেশি বেশি ফতোয়া জিজ্ঞেস করুক, সে ফতোয়া দেয়ার যোগ্যই না।(ইমাম আজুররী, আখলাকুল উলামা, ১০৪
নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা ১৩৫)

এ জন্য ফিকহ-ফতোয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞ তরুণ আলেমদের উচিত হলো, কোনো ফতোয়া দেয়ার আগে অভিজ্ঞ কোনো মুফতী সাহেবের সাথে পরামর্শ করা। লাইভ অনুষ্ঠানে ফতোয়া না দেয়াই শ্রেয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে কখনো দিতে
হলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। সে ক্ষেত্রে যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকবে না সেখানে 'জানি না' বলা জরুরি। অথবা এটাও বলা যায়, পরবর্তী সময়ে এটা জানানো হবে। কেউ কেউ মনে করেন, সবার সামনে আমি জানি
না বলব, এটা তো আমার জন্য লজ্জার বিষয়। এটা শয়তানের ধোঁকা। শয়তান চক্ষুলজ্জার ভয় দেখিয়ে হুটহাট ফতওয়া দেয়ায় লিপ্ত করে দেয়। ফলে কখনো কখনো মারাত্মক ভুলও হয়ে যায়। সবচেয়ে সহজ মাসআলাও যদি কেউ ভুলে
যায় এটা স্বাভাবিক ব্যাপার। ফতোয়া দেয়া হলো আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব। তাই ভুল ফতোয়া দেয়ার চেয়ে 'জানা নেই' বা 'পরে উত্তর দেবো' বলাই জরুরি।

মুহতামীম সাহেবদের কে শয়তানের ধোকা

দ্বীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হলো দ্বীনের অন্যতম দুর্গ। আর এর কর্ণধারগণ হলেন এর দিকপাল, যারা দিন-রাত পরিশ্রম করে শত শত ছাত্র-শিক্ষকের একটি প্রতিষ্ঠানকে পরম যত্নে আগলে রাখেন। এ কথা অনস্বীকার্য, মাদরাসায় যত ছাত্র-উস্তাদ থাকুক, যত মেধাবী ছাত্র ও দক্ষ শিক্ষক থাকুক, বাহ্যত সবাইকেই তার ওপর ভরসা করতে হয়। কিন্তু শয়তান এখানেও তো চুপচাপ বসে থাকে না। তাই এখানেও সে কিছু কিছু মুহতামীমদের ধোঁকা দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে, যাতে দ্বীনের এই দুর্গগুলোকে দুর্বল করা যায়। কারণ, দুর্গের তত্ত্বাবধায়ক যখন বিগড়ে যাবেন, তখন দুর্গ হাতছাড়া হয়ে যাওয়াও খুব সহজ। মাদরাসা প্রতিষ্ঠার আগে লক্ষ রাখা উচিত, মাদরাসা পরিচালনা করার মতো সার্বিক যোগ্যতা আছে কি না।

মাদরাসা প্রতিষ্ঠার শুরুতেই আবশ্যক হলো অভিজ্ঞ কয়েকজন উলামায়ে কেরামকে মাদরাসার শুরা কমিটিতে রাখা। মাদরাসার সার্বিক বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করা। বিশেষ করে ইলমি বিষয়ে অবশ্যই তাদের সাথে পরামর্শ করা। কিন্তু শয়তান কারও কারও মাথায় ঢুকিয়ে দেয় যে, শুরা কমিটি রাখা মানেই হচ্ছে একক ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করা। ফলে তারা নিজেরাই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন। কেউ কেউ ইহতিমামী ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায়ও শুরা কমিটি রাখতে চান না বা নামকাওয়াস্তে রাখলেও সব বিষয়ে তাদের সাথে পরামর্শ করেন না। ফলে পরবর্তী সময়ে মাদরাসায় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। উম্মুল মাদারিস দারুল উলুম দেওবন্দেও শুরা কমিটি রয়েছে। সেখানেও বার্ষিক মিটিংয়ে মুহতামীম সাহেবকে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হয়।

এ জন্য মুহতামীম সাহেবদের উচিত নিজ প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাকে নিজের কুক্ষিগত
সম্পদ মনে না করা; বরং এটাকে জাতির আমানত মনে করা। এই আমানত রক্ষার জন্য যা যা করা দরকার সবকিছু করা। আজকাল অনেকে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ব্যবসার নিয়তে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছেন। এটা একজন আলেম বরং সাধারণ মুসলিমের জন্যও কোনোভাবে কাম্য হতে পারে না। মাদরাসা কোনোভাবেই ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়—এটা ভালোভাবে মনে রাখা। মাদরাসা ইখলাস ও লিল্লাহিয়্যাতের সাথে প্রতিষ্ঠা করা।

মাদরাসা-সংশ্লিষ্ট সকলকেই, বিশেষত মুহতামীম ও সাধারণ শিক্ষক সকলের জন্যই জরুরি হলো, মহিলা গার্ডিয়ানদের সাথে সাক্ষাৎ থেকে বিরত থাকা।শয়তান এ ব্যাপারে মারাত্মক ধোঁকা দেয়। মাসিক খোরাকি জমা নেয়া, ভর্তি-সংক্রান্ত কাজকর্ম ইত্যাদি কাজে মহিলা গার্ডিয়ানদের সাথে দেখা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এমনকি পর্দা করে সামনে বসেও কথা বলা উচিত না। পুরুষ অভিভাবক এসব কাজ সারবেন। পুরুষ অভিভাবক না থাকলে

অন্য ছোট ছাত্রের মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হতে পারে। অথবা রুমের বাইরে থেকে কথা বলা যেতে পারে।

মাদ্রাসার উস্তাদদের শয়তানের ধোঁকা

মাদরাসার উস্তাদগণ হলেন মাদরাসার ভিত্তির মতো। ভিত্তি মজবুত হলে যেমন ভবন স্থায়ী হয়, তেমনইভাবে মাদরাসার উস্তাদদের সততা, আমানতদারিতা ও সময়ানুবর্তিতা ঠিক থাকলে মাদরাসাও স্থায়ী হবে।

কোনো কোনো উস্তাদ মুহতামীম সাহেবের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে তার গীবত-সমালোচনা করতে থাকেন। মানবীয় দুর্বলতা হেতু মুহতামীম সাহেবদের
স্বেচ্ছাচারিতা বা কিছু দোষ থাকাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, তবে তার অগোচরে গীবতে লিপ্ত হওয়া তো জায়েয নয়। যদি কোনোভাবেই এই প্রতিষ্ঠানে থাকা সম্ভব না হয়, তাহলে মাদরাসা পরিবর্তন করাই ভালো।

কিন্তু শয়তান গীবতের এই ক্ষেত্রকে একেবারেই ভুলিয়ে দেয়। অনেক উস্তাদ একত্র হয়ে মুহতামীম সাহেবের দোষচর্চা করতে থাকেন এবং এটা যে গীবত হচ্ছে এ ব্যাপারেও কোনো ভ্রুক্ষেপ থাকে না। ফলে তওবা বা মুহতামীম সাহেবের কাছে ক্ষমা চাওয়ারও সুযোগ হয় না।

খেদমতের ক্ষেত্রে উত্তম হলো নিজের কাজ নিজে করা। যদি কোনো কাজ নিজে করা সম্ভব না হয়, তাহলে বড় ছাত্রদের দিয়ে কাজ নেয়া।

মাদরাসা ও মসজিদে অনেক নাবালগ ও সুদর্শন বালক পড়াশোনা কিংবা নামাজ ইত্যাদির জন্য আসা-যাওয়া করে থাকে। এদের ব্যাপারে মাদরাসার শিক্ষক-স্টাফ ও মসজিদের ইমাম-মুআজ্জিনদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকা চাই। শয়তান এদের মাধ্যমে ফাঁদ তৈরি করে কতশত আলেম আর হাফেজের সম্মান নষ্ট করেছে তা হিসেব করে বলা মুশকিল।
মাদরাসার আর্থিক কোনো দায়িত্ব অথবা ছাত্রদের টাকা-পয়সা জমা রাখার দায়িত্ব চেয়ে নেয়া উচিত নয়। যথাসম্ভব এ সকল দায়িত্ব থেকে দূরে থাকা। তবে মাদরাসা থেকে দায়িত্ব দেয়া হলে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্ক থাকা জরুরি। কোনোভাবেই
নিজের টাকার সাথে মাদরাসার টাকা মিলিয়ে না রাখা। অল্প পরিমাণে হলেও ভিন্ন রাখা জরুরি।

মাদরাসার উস্তাদদের দেয়া শয়তানের একটি মারাত্মক ধোঁকা হলো, ছাত্রদের মহিলা অভিভাবকের সাথে ফোনে কথা বলা। শুরুটা ছাত্রের খোঁজখবর নেয়ার মাধ্যমে হলেও পরবর্তী

সময়ে এটা মারাত্মক ফিতনার আকার ধারণ করে। এজন্য উচিত হলো, কোনো উস্তাদ ছাত্রের মহিলা অভিভাবককে নিজের নম্বর দেবেন না। পুরুষ অভিভাবকদের সাথে ফোনে বা সাক্ষাতে কথা বলাই উত্তম। মোটকথা, কোনোভাবেই যাতে শয়তানের ধোঁকায় পড়তে না হয়—এ ব্যাপারে সাবধান থাকা চাই।

উস্তাদদের উচিত নয় ছাত্রদের সামনে খুব বেশি মোবাইল ব্যবহার করা। ফোনে কথাবার্তা বলা যেতে পারে, কিন্তু ফোনে কিতাবাদি পড়া বা অন্যান্য কাজ অগোচরে করাই উত্তম। কারণ, ছাত্রদের সামনে বেশি বেশি মোবাইল ব্যবহার

করার অন্যতম ক্ষতি হলো, এর মাধ্যমে ছাত্রদের দিলে মোবাইল-আসক্তি তৈরি হয়। মোবাইল বিষয়ে তালেবে ইলমদের অন্তরে ইতিবাচক ধারণা তৈরি হয়, যা তাদের ইলমি জিন্দেগীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ জন্য মোবাইলে ব্যক্তিগত

কাজকর্ম নিজের রুমে বা আড়ালে করাই উচিত, যাতে ছাত্ররা মোবাইল ব্যবহারের প্রতি উৎসাহ না পায়। উস্তাদদের জন্য ছাত্রকে কোনো অবস্থাতেই এমন কোনো কাজ দেয়া উচিত নয়, যা সম্পূর্ণ করতে ইন্টারনেট সংযুক্ত মোবাইলের প্রয়োজন

হয়। মাদরাসার উস্তাদদের কেউ কেউ ছাত্রদের সাথে বেশি মিশে যান। কিন্তু এ সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে কখনোই ছাত্রদের কাছে মাদরাসা কর্তৃপক্ষ বা অন্য উস্তাদের সমালোচনা করা থেকে বেঁচে থাকা জরুরি।

ছাত্রদের সময় উস্তাদদের কাছে আমানতস্বরূপ। তাই এই আমানতের খিয়ানত করা যাবে না। যেটুকু সময় ছাত্রদের দেয়ার কথা, সেটুকু সময় পূর্ণই তাদের দেয়া জরুরি। সে সময় ব্যক্তিগত কোনো কাজ বা ইবাদতে মশগুল থাকা আমানতের খিয়ানত।

উস্তাদের জন্য জরুরি হলো, দরসের জন্য ভালোভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ বিষয়ে আরবি, উর্দু ও বাংলায় স্বতন্ত্র অনেক কিতাব রচিত হয়েছে। প্রথমত, খুবই মনোযোগ সহকারে, গুরুত্বের সাথে এ-সংক্রান্ত কিতাবাদি মুতালাআ করা।অতঃপর দরস প্রদানের ক্ষেত্রে কিতাবাদি থেকে প্রাপ্ত হেদায়েত ও নির্দেশনা গুরুত্বের সাথে অনুসরণ করা।

এমনভাবে দরস করানোর চেষ্টা করা, যেন ছাত্রদের কাছে দরসের সে সময়টুকু স্মরণীয় হয়ে থাকে। বহু বছর পরেও যেন সেই ছাত্র তার ছাত্রদের কাছে গর্বভরে বলতে পারে, আমার অমুক উস্তাদের দরস এমন ছিল। আমিও তাঁর মতো দরস করাতে চেষ্টা করি।

উস্তাদ-জমানায় ব্যক্তিগত আমলের ক্ষেত্রে অলসতা করা উচিত নয়। সারা দিন

দরস-তাদরীসে ব্যস্ত থেকে দিনশেষে মনে হতেই পারে, 'সারা দিন তো আমি উত্তম কাজেই ব্যস্ত ছিলাম, ব্যক্তিগত আমলের আর কী প্রয়োজন!' বরং অল্প হলেও ব্যক্তিগত আমলের প্রতি মনোনিবেশ করা চাই। দরসের সময় শুরু হওয়ার

আগে বা দরসের অবসরে ইশরাক নামাজ, মাগরিবের পর আওয়াবিন, শেষরাতে তাহাজ্জুদ, ফজরের পর তিলাওয়াত আর ফাঁকে ফাঁকে যিকির-আযকার যেন ছুটে না যায়—এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা। যে আমল যৌবন বয়সে না করা হবে, বৃদ্ধ বয়সে তা করা যাবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই। বিশেষত মাদরাসার উস্তাদগণ

হলেন রাহবারের মতো; তারা অসংখ্য ছাত্রের অনুসরণীয় হয়ে থাকেন। তাদের ব্যক্তিগত আমলের প্রভাব ছাত্রদের ওপর পড়ে দারুণভাবে। তাই অবসর সময়টুকু মোবাইল-ইন্টারনেটে ব্যয় না করে আমলে কাটানো।

ছাত্রদের শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই যাতে স্বজনপ্রীতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা। নিজের রুমের ছাত্র অথবা নিজের খাদেম হিসেবে শাস্তির তারতম্য করা উচিত না কোনোভাবেই। শাস্তি কার্যকরের ক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা বুঝে শাস্তি দেয়া। মোটকথা,শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কোনোভাবেই যাতে জুলুম না হয়, খেয়াল রাখা। কেউ কেউ শাসন করতে গিয়ে ছাত্রদের গালিগালাজ করে ফেলেন, এটা মারাত্মক জঘন্য অপরাধ। হাদীসে আছে,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوق ٌ

"মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী।
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮, ৬০৪৪, ৭০৭৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৪)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে গালি দেয় সে ফাসেক। আর মুসলমানদের মধ্যে তালিবুল ইলম তো বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এ ছাড়া একজন উস্তাদের সাথে এ আচরণ কোনোভাবেই মানানসই না। কেননা, একজন উস্তাদ ছাত্রদের

তরবিয়তের ক্ষেত্রে মানবজাতির শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্ব করেন। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে,

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحِّشًا

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বভাবগতভাবে অশ্লীলভাষী ছিলেন না
এবং অশ্লীলতার ভানকারীও ছিলেন না।'(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৩৫)

সর্বোপরি মাদরাসায় দরস-তাদরীসের খেদমতকে নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করা উচিত। কখনো দুনিয়াবি অন্য কোনো পেশার সাথে তুলনা করে এটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা উচিত নয়। সর্বোচ্চ পর্যায়ের সংযম, কৃচ্ছ্রসাধনের পরও যদি
মনে হয়, মাদরাসার ওযীফা নিজের দুনিয়াবি চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, তাহলে সুযোগ থাকলে শুরু থেকেই পাশাপাশি অন্য কোনো পেশা গ্রহণ করার চেষ্টা করা। একান্ত বাধ্য হলে অন্য পেশা গ্রহণ করা। অতঃপর সম্ভব হলে শিক্ষকতায়ও কিছু সময় দেয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু এ পবিত্র দায়িত্বে নিজেকে আটকে রেখে এমন কিছু করা কোনোভাবেই উচিত নয়, যা এর পবিত্রতাকে ভূলুণ্ঠিত করে।

মাদরাসার সমস্ত উস্তাদ থাকবেন এক সুতোর মতো। তাদের মাঝে হৃদ্যতা, হামদর্দীর প্রভাব ছাত্রদের ওপরও পড়ে দারুণভাবে; আর তাদের মাঝে কোনো মতবিরোধ হলে ছাত্ররাও বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কারও দোষ অনুসন্ধান অথবা তার
বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করা মারাত্মক গুনাহ। তাই তো আল্লাহ তাআলা মুমিনদের এমন করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাকো। কারণ, কিছু কিছু অনুমান তো পাপ এবং তোমরা কারও গোপনীয় দোষ
অনুসন্ধান কোরো না। (সুরা হুজুরাত,১২)

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযি.-এর নিকট জনৈক ব্যক্তিকে আনা হলো, যার দাড়ি থেকে তখনো মদের ফোঁটা ঝরছিল, অতঃপর তিনি বললেন,

إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ، وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذْ بِهِ.

‘আমাদেরকে গোয়েন্দাগিরি বা কারও দোষ অনুসন্ধান করতে নিষেধ করা
হয়েছে। তবে (গোয়েন্দাগিরি ছাড়াই) আমাদের নিকট কোনো কিছু প্রকাশ পেয়ে
গেলে সে জন্য আমরা তাকে পাকড়াও করতে পারি।’(সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৪৮৯০, সহীহ)

আমাদের নিকট কোনো কিছু প্রকাশ পেয়ে গেলে সে জন্য আমরা তাকে পাকড়াও করতে পারি।(সুনানু আবী দাউদ, হাদীস নং ৪৮৯০, সহীহ)

ওয়ায়েজ ও বক্তাদের প্রতি শয়তানের ধোঁকা

পূর্বে ওয়ায়েজদের মজলিসে বড় বড় আলেম ও ফকীহগণ হাজির হতেন। উবাইদ ইবনে উমাইর তাবেঈর ওয়াজ মজলিসে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে
উমর (রাঃ)-এর ন্যায় বিশিষ্ট সাহাবী হাজির হতেন । উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) ও ওয়াজ মজলিসে হাজির হতেন। কিন্তু পরবর্তীতে এটা পেশায় পরিণত হয়ে যায়। ওয়ায়েজদের মজলিসে আলেমদের পরিবর্তে জাহেল ও সাধারণ
লোকই অংশগ্রহণ করে। তখন ওয়ায়েজরা ইলম বাদ দিয়ে সাধারণ লোকের রুচি ও পছন্দ অনুপাতে কিসসা কাহিনী শিখতে ও বলতে শুরু করে। কতক লোক মানুষকে ভীত করার উদ্দেশ্যে এবং তাদের অন্তর নম্র করার উদ্দেশ্যে
মিথ্যা হাদীস গড়ে । শয়তান তাদেরকে এ প্ররোচনা দেয় যে, তোমরা তো দ্বীনের
স্বার্থেই হাদীস গড়েছো । অতএব এতে অসুবিধার কিছু নেই। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, কেউ যদি জেনে শুনে আমার প্রতি সম্বন্ধ করে কোন মিথ্যা হাদীস বলে তবে সে যেন আপন ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।

কিছু ওয়ায়েজ কৃত্রিম কান্না করে। মানুষকে দেখায় যে তার অন্তর আল্লাহর ভয়ে বিগলিত। অথচ তার অন্তর পাথরের ন্যায় শক্ত। এরূপ
কৃত্রিমতার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। কোন কোন ওয়ায়েজ কোরআন তেলাওয়াত করে গানের সুরে । অথচ এটা হারাম ও নাজায়েয ।

কোন ওয়ায়েজ ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর মর্সিয়া এমন সুরে গায় এবং ঘটনাকে এমন অতিরঞ্জিত করে যার ফলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত শ্রোতা
মাতম শুরু করে দেয় । অথচ এ ক্ষেত্রে উচিৎ ছিল তাঁর শাহাদতের কথা বর্ণনা করে সবর ও ধৈর্যের শিক্ষা ও উপদেশ দান করা ।

কেউ কেউ ওয়ায়েজ ওয়াজের মঞ্চে বসে ইলমে মারেফাতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় এবং ইশকে এলাহীর বর্ণনা করতে শুরু করে আর শয়তান অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করে দেয় যে, তুমি তো বহু উপরের মাকামে পৌছে গেছ। নতুবা এসব কথা কিভাবে বলতে পারছ? জেনে রাখুন, মুখে বলা আর প্রকৃতপক্ষে মাকামে পৌঁছা এক নয় । এটা শয়তানের ধোকা।

বর্তমানযুগের ওয়াজের সিংহভাগই হচ্ছে ইউসুফ জুলাইখার কাহিনী , মূসা
(আঃ)-এর কাহিনী , ফরহাদ শিরীনের কাহিনী । দ্বীনের জরুরী বিষয় সম্বন্ধে
আলোচনা খুব কমই হয়ে থাকে। যার ফলে মানুষ আল্লাহর হক ও বান্দার হক

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যায়। এবং সে সব হক আদায় করারও স্পৃহা জাগে না। আর মানুষও ঐসব কিস্সা কাহিনী শুনতে বেশী আগ্রহী । কারণ এতে কোন ভার নেই । পক্ষান্তরে হক আদায় করা কঠিন বিষয় । মন সেটা করতে চায় না ।

কতক ওয়ায়েজ সূফী সেজে মানুষকে সংসার বর্জন করে ইবাদত বন্দেগীতে লেগে যাওয়ার জন্য এত উৎসাহিত করে যে, তারা পরিবার পরিজন ছেড়ে বনে জঙ্গলে চলে যায়। ঐ দিকে বিবি বাচ্চা অসহায় অবস্থায় মানুষের কাছে হাত পেতে বেড়ায় ।

কয়েকজন ওয়ায়েজ মানুষকে শুধু আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার কথা শুনায়; আল্লাহর মহত্ব ও বড়াইয়ের কথা বর্ণনা করে না। ফলে মানুষ গোনাহ ও মন্দ কাজ থেকে তওবা করে না; বরং গোনাহর কাজে আরো সাহস পেয়ে যায় ।

কতক ওয়ায়েজ মর্যাদা মোহের শিকার হয়ে পড়ে। এর আলামত হল, তার পরিবর্তে অন্য কেউ যদি ওয়াজ করতে চায় তবে সেটা অপছন্দ করে । অথচ যদি সে মুখলেস হত এবং ইসলাহ ও সংশোধনই উদ্দেশ্য হত তাহলে যে কেউ এ কাজ করত সে তাতে সম্মত ও রাজী থাকত ।

কেউ কেউ ওয়ায়েজের ওয়াজের মজলিসে নারী পুরুষ সবাই একত্র হয়। মহিলারা প্রভাবিত হয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে শুরু করে। ওয়ায়েজ এতে বাধা দেন না, যাতে সবার আকর্ষণ তার প্রতি বহাল থাকে ।

কিছু ওয়ায়েজ তো ওয়াজকে একটা পেশা হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছে। ওয়াজ করার জন্য নিজেকে আমীর উমারাদের কাছে পেশ করে।

কতক আলেমকে শয়তান এভাবে ধোকা দেয় যে, তুমি ওয়াজের যোগ্য নও। কারণ ওয়াজ করতে হলে আরো ইলম ও আমলের প্রয়োজন। ওয়াজ করতে গেলে তোমার মাঝে রিয়া সৃষ্টি হবে যা হারাম। এ বলে তাকে ভাল কাজ থেকে বিরত রাখে। এ বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে।

ছাবেত বুনানী (রহঃ) বর্ণনা করেন, কোন এক মজলিসে হাসান বসরী (রহঃ) উপস্থিত ছিলেন। তাহাকে বলা হল, আপনি কিছু উপদেশমূলক কথা

বলুন। তিনি বললেন, আমি কি উপদেশ দানের যোগ্য হয়েছি? যা হোক পরে তিনি কিছু উদেশমূলক কথা বললেন। ছাবেত (রহঃ) বলেন, তাঁর কথা আমার নিকট খুবই পছন্দ হল । এরপর হাসান বসরী (রহঃ) বললেন, শয়তান জানত যে, তোমরা হাসান বসরী থেকে এ উপদেশ গ্রহণ করবে যে, সে কখনও ভাল কাজের আদেশ করেনি এবং মন্দ কাজে নিষেধ করেনি। তাই আমি তার মাধ্যমে ওয়াজ করিয়ে শয়তানের এ সুযোগটি নষ্ট করে দিলাম । [২]

লেখক-কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি শয়তানের ধোকা

আমার লেখনীতে মূলত থাকবেন দ্বীনদার ট্যাগ লাগানো লেখক-কবি-সাহিত্যিকগণ। সেক্যুলার ও বেদ্বীন লেখক আমাদের আলোচনার বাইরে। কারণ,তারা তো শয়তানের কথাকেই তাদের ভাষায় লেখেন।

লেখক-কবি-সাহিত্যিকগণ হলেন সমাজের এলিট-শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তাই তাদের ভক্তবৃন্দও থাকে অন্যদের থেকে বেশি। তাদের ক্ষুরধার কলমের খোঁচায় কত সাম্রাজ্য টলে গেল! আবার তাদেরই কলমের ‘সাদা’ কালিতে কত সত্য ইতিহাস ধুয়ে-মুছে সাফ হয়ে গেল! একজন লেখক পারেন সমাজের বিরাট একটি অংশের
চিন্তা-চেতনায় আমূল পরিবর্তন আনতে। আবার একজন লেখকের মাধ্যমে বিরাট একটি পাঠকশ্রেণি কালো ও অসত্য চিন্তার গহ্বরে হারিয়ে যায়। একজন পাঠক স্বাভাবিকভাবেই একজন লেখককে অনুসরণীয় ভাবে। তার মতো করে চলতে চায়, কথা বলতে চায়; এমন অনেক পাঠক আছে, যারা লেখক যা বলে-লেখে
সবকিছুকেই অন্ধের মতো বিশ্বাস করে ফেলে!

শয়তানের একটি অন্যতম ধোঁকা হলো, মানুষকে ‘লাগামহীন' সাহিত্য-চর্চায় লিপ্ত করে দেয়া। সাহিত্য-চর্চা নতুন কোনো বিষয় নয়, ইসলাম-পূর্ব যুগ থেকেই এর ব্যাপক প্রচলন চলে আসছে। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের
যুগেও এর প্রচলন ছিল। কিন্তু শয়তানের ধোঁকা বলতে যা বোঝাতে চেয়েছি তা হলো, সাহিত্য-চর্চা করতে গিয়ে শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করে ফেলা,
শরীয়তের সাথে সাংঘর্ষিক কাজ করা। অনেক দ্বীনদার ব্যক্তি সাহিত্য-চর্চা করতে গিয়ে নিজের স্বকীয়তা, পরিচয় ও আত্মমর্যাদাবোধ খুইয়ে বসেন। অনেক মাদরাসা- পড়ুয়া ভাই-বোন সাহিত্য-চর্চা করতে গিয়ে নিজের জাতপাত ভুলে অন্য পরিচয়ে পরিচিত হতে পছন্দ করেন। নিজের পরিচয় ভুলে থাকাতেই গর্ববোধ করেন।কিছু কবি-সাহিত্যিক সাহিত্য-চর্চা করতে গিয়ে নিজের দ্বীনকেই প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলেন। বেগানা নারীদের সাথে ওঠাবসা,

অহরহ নামাজ ত্যাগ করা, সাহিত্যের নামে প্রশ্নবিদ্ধ শব্দ দিয়ে সাহিত্য-চর্চা করা—এসব যেন নিত্যদিনের অভিযোগ!

লেখালেখির জগতে সাধারণত দুইটি দিক রয়েছে—ইসলামী দিক ও সেক্যুলার দিক। সেক্যুলারদের মাঝে সাহিত্য দিয়ে ইসলামের বাণীগুলো পৌঁছানো অবশ্যই প্রশংসনীয় এবং প্রয়োজনীয় কাজ। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে কেউ কেউ খেই হারিয়ে ফেলেন। তাদেরকে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে উল্টো নিজের শরীরেই
সেই বাতাস লেগে যায়।

'আলেম' নামধারী কিছু মানুষ থাকেন, যারা কবিতার নামে এমন সব কবিতা লেখেন, যা কেবল অবৈধ প্রেমকেই উসকে দেয়। এ ছাড়াও গাইরে মাহরাম নারীদের সাথে তাদের ওঠাবসা, হাসিমুখে ছবি তোলা, টাখনুর নিচে পোশাক
পরিধান, নামাজ ত্যাগ করা, ছেলে-মেয়ে একসাথে অনুষ্ঠান করা-সহ অসংখ্য গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়েন তারা। এসবের শুরু কিন্তু হয়েছে ছাত্র-জমানায় সেই লাগামহীন সাহিত্য-চর্চার মাধ্যমেই।

সাহিত্যের নামে প্রেমময় উপন্যাস রচনা করা, যার মূল বিষয়ই থাকে অবৈধ সম্পর্ক ও অশ্লীল কথাবার্তা, এমন লেখকের সংখ্যাও এখন কম নয়।
লেখকদের কেউ কেউ লেখালেখি করতে গিয়ে দ্বীন-দুনিয়া সবকিছুই ভুলে যান। পরিবারের কোনো খবর থাকে না। নিজের শরীরের কোনো খবর থাকে না। এমনকি কারও কারও ব্যক্তিগত আমলের প্রতিও খেয়াল থাকে না। তারা
লেখালেখির ভেতর ডুবে গিয়ে দ্বীন-দুনিয়াসংশ্লিষ্ট বহু গুরুত্বপূর্ণ আমল ছেড়ে দেন। এ ধরনের আচরণ কোনোভাবেই কাম্য নয়। কখনো মনে হয়, আধা ঘণ্টা তিলাওয়াত করার চেয়ে লেখালেখিই ভালো। তিলাওয়াত তো ব্যক্তিগত আমল,
লেখালেখি সবার জন্য উপকারী।

কেউ কেউ লেখালেখির কারণে নামাজের কথা বেমালুম ভুলে যান। নামাজের সময় চলে যাচ্ছে, আর তিনি লিখেই যাচ্ছেন। বাস্তবতা হলো, নামাজের ঠিক আগমুহূর্তেই শয়তান মাথায় অনেক লেখা হাজির করে দেয়। তখন মনে হয়,
লেখাটা এখনই না লিখলে ভুলে যাব।

লেখালেখি, সাহিত্য-চর্চা করতে গিয়ে কেউ কেউ সন্ন্যাসীর জীবনধারণ করেন। পরিবারের খোঁজ নেয়ার মতো সময় হয় না। বিশেষত কবিদের কেউ কেউ কবি কবি ভাব প্রকাশের জন্য চুল-দাড়িতে পরিবর্তন সাধন করেন। অনেক দ্বীনদার
কবিকে দেখেছি গোঁফ এত বড় রেখেছেন, যা শরয়ী সীমা লঙ্ঘন করে। কারণ,তারা ভাবেন, কবি হতে হলে ঠোঁট পেরোনো গোঁফ রাখতেই হবে। মাথায় উশকোখুশকো চুল রাখতে হবে। মাথায় কখনো টুপি ওঠানোই যাবে না। সাহিত্য-
সংশ্লিষ্ট যেকোনো সভা-মজলিসে যেতে হবে, যদিও তাতে শরীয়ত-বিরোধী বহু অনুষঙ্গ বিদ্যমান থাকুক। কবিদের কেউ কেউ এমন শব্দ বা বাক্য দিয়ে কবিতা লেখেন, যা শরীয়ত কোনোভাবেই সমর্থন করে না। তারা মনে করেন, কবিদের সাতখুন মাফ। আবার কেউ কেউ বলেন, সাহিত্য-চর্চার জন্য এসব জায়েয আছে। এ সবই শয়তানের ধোঁকা। সাহিত্যের নামে এমন লাগামহীন সাহিত্য-চর্চা শরীয়ত কখনোই সমর্থন করে না। অর্থাৎ, শরীয়তের গণ্ডির ভেতরে থেকেই সাহিত্য-চর্চা করতে হবে। কারণ, শরীয়ত কখনোই সাহিত্য-চর্চা লাগামহীন করে দেয়নি এবং এই চর্চা করতে গিয়ে নিজের স্বকীয়তা ভুলে যেতে বলেনি।

বেশিরভাগ লেখকই সেলিব্রিটি পর্যায়ের হয়ে থাকেন। ফলে তাদের একটি ভক্তদল তৈরি হয়ে যায়, যারা ওই লেখকের সমস্ত কথাকেই বিনা বাক্যে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। এটার একটা পজিটিভ দিক হলো, এই সুযোগে লেখক
চাইলে বিশাল একটি পাঠকশ্রেণির মাঝে দ্বীনের দাওয়াত খুব সহজেই পৌঁছাতে কেউ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেন না। ফলে তাদের মধ্যে মারাত্মক অহংবোধ পারেন। কিন্তু এটার একটি নেতিবাচক দিক হলো, বিশাল ফ্যানব্যাজ দেখে কেউ চলে আসে। আর এই সুযোগে শয়তান তাকে বিভিন্ন ধোঁকায় ফেলে দেয়। এই ধোঁকায় পড়েই কখনো কখনো সাধারণ লেখকও শরীয়তের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত দিয়ে ফেলেন। শরীয়তের সিদ্ধান্তকৃত কোনো মাসআলায় নিজস্ব মতামত
ব্যক্ত করে বসেন। আর তার বিশাল ফ্যানব্যাজ তখন তার কথাকেই সঠিক মনে করে শরীয়তের বিধানের উল্টো আমল শুরু করে দেয়।এ জন্য লেখকদের উচিত অনলাইনে কোনো কিছু লেখার আগে ভেবে নেয়া। তার এ লেখা যেন ফ্যানব্যাজ ঠিক রাখার জন্য না হয়; বরং শরীয়তের মানদণ্ড
অনুযায়ী হয়।

কোনো কোনো লেখকের অভ্যাস হলো, কোনো বিষয়ে পরিপূর্ণ মুতালাআর পূর্বেই সে বিষয়ে লিখে ফেলা। এতে সমস্যা দুই ধরনের হয়—হয়তো তার লেখায় মারাত্মক ভুল থেকে যায়, অথবা লেখা ঠিক হলেও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কেউ কেউ এটা নিয়ে গর্বও করেন, ‘আমার

এ বইটা লেখার সময় কোনো বই থেকেই সাহায্য নেয়া লাগেনি আলহামদুলিল্লাহ!' এটাও শয়তানের ধোঁকা।

লেখকদের সাবধান থাকা উচিত, যেন তাদের প্রসিদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কোনো অসৎ লোক ওপরে উঠতে না পারে এবং তার নাম বিক্রি করে অসৎ কাজ করতে না পারে। বেশিরভাগ লেখক লেখালেখিতেই সারা দিন ব্যস্ত থাকেন। তাই
লেখকদের জন্য উচিত নয়, কারও ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা না রেখেই তার কোনো বই বা অন্য কোনো কাজে সমর্থন দিয়ে দেয়া। কারণ, পাঠকশ্রেণি যখন দেখবে তার মতো ব্যক্তিত্ব সমর্থন করেছে, তাহলে নিশ্চয়ই কাজটি ভালো।

কোনো মজলিসে যাওয়া-আসা, কারও সাথে ওঠাবসার ক্ষেত্রেও লেখকদের সাবধান থাকা উচিত। কোনো সভা-মজলিসে দাওয়াত পেলে পূর্ণ তাহকীক না করে সেখানে উপস্থিত হওয়া উচিত না। কারণ, হতে পারে লেখকের অজান্তেই
এখানে শরীয়ত-বিরোধী কোনো কাজকর্ম হচ্ছে। তাই এ সকল ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ পর্যায়ের সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রকাশকদের শয়তানের ধোঁকা

বই প্রকাশের পর এর ভালো-মন্দের দায়ভারের একটা বড় অংশ কিন্তু প্রকাশকের ওপর বর্তায়। তাই বইয়ের বিষয়-লেখক-অনুবাদক যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও তাকে সতর্ক থাকা জরুরি। কোনো প্রকাশক যদি শুধু বইয়ের কাটতির ওপর নির্ভর করে বিখ্যাত এমন কোনো লেখক বা অনুবাদকের বই ছাপান, যার লেখা বা অনুবাদে শরীয়ত-বিরোধী কথা রয়েছে, তাহলে এই বই পড়ে যত পাঠক বিভ্রান্ত হবে, এর দায়ভারের একাংশ প্রকাশকের ওপরও বর্তাবে। এমনইভাবে বইয়ের বিষয় নির্বাচনেও পাঠকের উপকারিতার দিক দেখা জরুরি।

কোনো কোনো প্রকাশক আছেন, অন্য লেখকের বই হুবহু বা আংশিক কপি করে ভিন্ন নামে বা মূল নামেই ছাপিয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে অনুমতি গ্রহণের কোনো প্রয়োজনীয়তা তারা অনুভব করেন না, অথচ বই প্রকাশের পূর্বে এই অনুমতি গ্রহণ একান্ত জরুরি। ইদানীং একটা বিষয় খুব বেশি দেখা যাচ্ছে, কোনো বই ভালো বিক্রি হলে কিছু অসাধু প্রকাশক পুরো বই কপি করে নিজেদের নামে ছাপিয়ে দেন। এতে যেমন অন্যের হক নষ্ট করার গুনাহ হয়, তেমনইভাবে পাঠকদেরকেও ধোঁকা দেয়া হয়। এ ধরনের গর্হিত কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকা জরুরি।

পাঠকদের শয়তানের ধোকা

বইপাঠ ইলম বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। যে যত পড়বে, তার ইলম তত বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু সব ধরনের বই পাঠে ইলম বাড়ে না, সব পাঠ উপকারীও নয়। একজন সচেতন পাঠক যদি এ ব্যাপারে সতর্ক না থাকেন, তাহলে দেখা যাবে, প্রচুর পড়াশোনা করার পরও উপকারের চেয়ে ক্ষতির পাল্লাই বেশি।

একজন পাঠকের জন্য সবচেয়ে বড় ধোঁকা হলো, যাচাই-বাছাই করার যোগ্যতা না থাকার পরও সব বই দেদারসে পড়া এবং সব বইয়ের কথাকেই বিনা বাক্যে মেনে নেয়া। এর চেয়েও বড় মারাত্মক ধোঁকা হলো, দ্বীন ও আদর্শ-বিবর্জিত লেখকদের বই পড়ে তা গোগ্রাসে গিলে নেয়া এবং নিজেকে সে সমস্ত লেখার কাল্পনিক চরিত্রে ভাবতে শুরু করা।

এ যুগের পাঠকদের শয়তান ধোঁকা দেয় আরও সহজভাবে। চমকপ্রদ প্রচ্ছদ আর মনকাড়া নাম দেখে অনেকেই ধোঁকায় পড়ে যান। অথচ এ বই থেকে হয়তো তার নেয়ার মতো কিছুই নেই; বরং তার থেকে ছিনিয়ে নেয়ার মতোই বহু উপাদান
হয়তো বইটিতে রয়েছে।

সাহিত্য-চর্চার জন্য অনেকেই প্রেমময় উপন্যাস ও আদর্শ-বিবর্জিত বই পড়েন। তারা মনে করেন, সাহিত্য-চর্চার জন্য এ সকল বই পড়া আবশ্যক। অথচ একটা সময় পর্যন্ত এ ধরনের বই শুধু ক্ষতিকারকই নয়, বরং মারাত্মক পর্যায়ের
ক্ষতিকারক। তাই বই পাঠের ক্ষেত্রে আহলে ইলম ও মুরুব্বির পরামর্শ গ্রহণ একান্ত জরুরি। আফসোসের কথা হলো, এসব বই পড়তে পড়তে মাদরাসা-পড়ুয়া কিছু ছাত্র-ছাত্রীর চিন্তা-চেতনায় মারাত্মক পরিবর্তন চলে আসে,এমনকি
পথচ্যুতও হয়ে যায়।। তারাও কিন্তু শয়তানের ধোঁকাতেই প্রথমে এসব বই পড়া শুরু করে। এ জন্য একটা বিষয় মাথায় রাখা চাই, সাহিত্যিক হওয়ার চেয়ে নিজের দ্বীন-ধর্ম-পরিচয় ঠিক রাখা জরুরি। যে কাজ আমার পরিচয় ভুলিয়ে দেবে, আমাকে আমার পথ থেকে সরিয়ে দেবে, সে কাজ কখনোই আমার হতে পারে না। সে কাজের যতই দুনিয়াবি ফায়দা থাকুক, কখনোই তা আমাকে ফায়দা দিতে পারে না।

এ জন্য অভিজ্ঞ কারও সাথে পরামর্শ করে বই সংগ্রহ করা উচিত; বইটি তার জন্য উপকারী কি না, বইটিতে কোনো সমস্যা আছে কি না ইত্যাদি। বই পাঠের ক্ষেত্রে পরামর্শের মতো আবশ্যকীয় বিষয়ে গুরুত্ব না দেয়ায়, অনেক ছোট ছেলেপেলেকে দেখেছি, তারা 'কিছু' বই পড়েই উম্মাহর বড় বড় আলেমদের
মুরতাদ পর্যন্ত বলে ফেলে! এটা শয়তানের মারাত্মক ধোঁকা এবং গোমরাহ করার

শুরুমাত্র। তাদের মনে থাকে না, আলেমদের প্রতি, বিশেষত যারা উস্তাদতুল্য, তাদের ব্যাপারে কোনো ধরনের বাজে মন্তব্য করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কিন্তু এই ফিতনাই এখন বেশি দেখা যায়।

নাস্তিকদের জবাবে লেখা বই বেশি বেশি পড়ার কারণে অনেক সাধারণ পাঠক
ধোঁকায় পড়ে যান। উল্টো তাদের মনের ভেতরেই বিভিন্ন সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়।
তাই এ ব্যাপারেও সাবধান থাকা জরুরি।

কোনো কোনো পাঠক বই সংগ্রহ করাকে ফ্যাশন মনে করেন। কয়েক দিন পরপর বহু টাকার বই সংগ্রহ করেন। কিন্তু অধিকাংশ বই তার উপযোগী না বা তারজন্য উপকারী না বা তার পড়া হয় না। এটা নিঃসন্দেহে শয়তানের ধোঁকা। শয়তান উপকারী কাজেটাকা খরচ করার পরিবর্তে নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে অনর্থক বই সংগ্রহ করায়।

কেউ কেউ আছেন, যারা বেশি বেশি পাঠ করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হন। ফলে গুরুত্ব সহকারে পাঠ না করে তাড়াতাড়ি পাঠ শেষ করে ফেলেন। এভাবে বহু বই পাঠ করলেও তাদের খুব একটা উপকার হয় না। এ জন্য বইপাঠ হওয়া চাই
নিজের উপকারের উদ্দেশ্যে।

অতিরিক্ত বই পাঠ কখনো কখনো আমলের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নামাজের সময় চলে যাচ্ছে, তবুও কেউ কেউ বই পড়তে থাকেন। অনেকে সারা দিন বই পড়তে পারলেও মাত্র আধা ঘণ্টা কুরআন তিলাওয়াত করার সময় পান না। কেউ কেউ গল্প-উপন্যাসে এতটাই মজে যান যে, ক্লাসের পড়াই পড়েন না।

কোনো কোনো দ্বীনদার ব্যক্তি সেক্যুলার-
নাস্তিকদের লেখা গল্প-উপন্যাস পড়ে
সেই গল্প-উপন্যাসের কাল্পনিক চরিত্রে নিজেকে ভাবা শুরু করে দেন। সেই চরিত্রের মতো পোশাক-আশাক, চুল, কথাবার্তা, এমনকি হাঁটাচলাও শুরু করে দেন। এটা নিঃসন্দেহে চিন্তার মারাত্মক দৈন্য।

কিছু কিছু পাঠকসভা, সাহিত্যসভা, কবিতার আসর, পাঠকদের মিলনমেলা, চা-চক্র ইত্যাদি বিভিন্ন নামে দ্বীনী ভাই-বোন, মাদরাসার উঠতি বয়সের ছাত্রভাইয়েরা যে মজমা করেন, যেখানে

মাহরাম, গাইরে মাহরামের কোনো পরোয়া করা হয় না, শরীয়ত একে বিন্দুমাত্র অনুমোদন দেয় না। এটাকে শয়তানের ধোঁকা বললেও কম হয়ে যাবে। এ জন্য যারা মুরুব্বিহীন সাহিত্য-চর্চা করেন, তাদের পথচ্যুত হতে বেশি দেরি লাগে না।

সাধারণ লোকদের শয়তানের ধোঁকা

দ্বীনী ইলমহীন সাধারণ লোকের জন্য শয়তানের ধোঁকা থেকে বেঁচে থাকা তুলনামূলক একটু কঠিন। কারণ, শয়তানের ধোঁকা ও শয়তানের বহুমুখী চরিত্র বোঝার মতো পর্যাপ্ত ইলম তাদের কাছে থাকে না।

শয়তান তাদের অনেককেই ধোঁকা দিয়ে জরুরি ইলম অর্জন থেকে বিরত রাখে। দুনিয়াবি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত করে দেয়। অথচ প্রয়োজন পরিমাণ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ। সে এখন নামাজ পড়বে, নামাজ-সংক্রান্ত যাবতীয় ইলম শেখা তার জন্য ফরজ। নামাজ যেমন ফরজ, এর ইলম অর্জন করা তেমনই ফরজ। অথচ ব্যস্ততার অজুহাতে এই ইলম অর্জন না করতে পারার কারণে অসংখ্য লোকের সারা জীবনের নামাজই বাতিল হয়ে যায়। অসংখ্য লোক এমন রয়েছে, যৌবন পেরিয়ে বৃদ্ধ হয়ে গেলেও এখনো নামাজ সহীহ হওয়ার
মতো কমপক্ষে পাঁচটি ছোট সূরা সে বিশুদ্ধভাবে পড়তে পারে না, তাশাহুদ পারে
না। কখন কী পড়তে হয় সেটাও জানে না। নামাজে মাসবুক হলে কী করণীয়
সেটাও জানে না। কী কারণে সাহু সিজদা ওয়াজিব হয়, নামাজ ভেঙে যায় বা
নামাজ মাকরুহ হয়—সেসবের কিছুই জানে না। সে মনে করে মসজিদে এসে অন্যদের দেখে কোনো রকম নামাজ আদায় করলেই হয়ে যাবে। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা যাবে, দুনিয়াবি বিভিন্ন বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান রয়েছে বা মানুষ তাকে বেশ শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ লোক হিসেবেই চেনে; কিন্তু শরীয়তের আবশ্যকীয় ইলমের
ক্ষেত্রে সে একেবারেই অজ্ঞ।

শুধু নামাজই না, বিয়ে-শাদী, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ক্ষেত্রেই সেই কাজ-সংক্রান্ত জরুরি ইলম অর্জন করা ফরজ। আজকালকার বিয়ে-শাদীতে কতটুকু দ্বীন মানা হয়, সুন্নাহর অনুসরণ কতটুকু করা হয় তা তো আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে।
ব্যবসা-বাণিজ্যে কী পরিমাণ ধোঁকা দেয়া হচ্ছে, দ্বীনের হুকুমের উল্টো পথে ব্যবসা করা হচ্ছে—তাও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু শয়তান এ-সংক্রান্ত ইলম অর্জনের ব্যাপারে সাধারণ লোকদের গাফেল করে রাখে।

শয়তান মানুষকে জরুরি ইলম অর্জন থেকে গাফেল করে রাখে। কারণ, অজ্ঞতাই
হলো শয়তানের ধোঁকার প্রথম স্তর। এই অজ্ঞতার কারণেই মানুষ বহু গুনাহে জড়িয়ে যাবে, কিন্তু সে অনুধাবনই করতে পারবে না বা তা থেকে ফিরতেও পারবে না। এ জন্য প্রত্যেক কাজ করার পূর্বে সে বিষয়ে শরীয়তের হুকুম-আহকাম জেনে

নেয়া প্রত্যেকের জন্য ফরজ।

সাধারণ মানুষ বিয়ে-শাদীর ক্ষেত্রে সুন্নাত কেবল ততটুকুই মনে করে, ছেলে-মেয়ে কবুল বলবে। ব্যস এতটুকুই। অথচ বিয়েতে যে আরও অনেক সুন্নাত, হালাল-হারামের বিধান রয়েছে এটা মানুষ জানেই না। শয়তান তাদেরকে জানতে দেয় না এ কারণে যে, এসব মাসআলা জানলে প্রচুর আমোদ-ফুর্তির মাধ্যমে অসংখ্য
মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করা যাবে না। প্রচুর টাকা অপচয় করানো যাবে না।

মানুষের দ্বীনদারী বা দ্বীন মানার আগ্রহ নিরূপণ করা যায় দুই জায়গায়—বিয়ে-শাদী আর লেনদেনে। এ দুই জায়গায় অসংখ্য দ্বীনদারও খেই হারিয়ে ফেলেন। দ্বীনের আহকামের তুলনায় সমাজের অপসংস্কৃতি তাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। বিয়েতে যদি সামাজিকতা রক্ষায় এসব অপচয় আর হই-হুল্লোড় না করি তাহলে
মানুষ কী বলবে, এটাই তখন মাথায় থাকে সবার। অথবা ধোঁকাটা হয়ে থাকে একটু ভিন্ন আঙ্গিকে। বড়রা চিন্তা করে, আমরা তো কিছু করছি না, বিয়ে বাড়িতে ছোটরা তো একটু হই-হুল্লোড় করবেই। অথচ কথিত এই ছোটদের জন্য আমরা যে ছাড় দিয়ে থাকি, শরীয়ত কোনোভাবেই তা সমর্থন করে না।উল্লেখ্য, বিয়েতে একেবারেই আনন্দ-উৎসব করা যাবে না, এটাও সঠিক নয়;
বরং হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, বৈধতার গণ্ডির ভেতরে থেকে বিয়েতে আনন্দ উদযাপন করার যথেষ্ট সুযোগ ইসলামী শরীয়তে রয়েছে।

সদ্য দ্বীনে ফেরা সাধারণ ব্যক্তিরা অনেক সময় ইবাদতের ক্ষেত্রে সংশয়ে ভোগেন। শয়তান তাদের মনে ওয়াসওয়াসা দেয়। ফলে তারা ইবাদত আদায় হওয়া নিয়ে প্রচুর দ্বিধায় ভোগেন। কেউ কেউ একটা কাজ বারবার করেন। এভাবে কখনো
কখনো আমলটিই বাতিল হয়ে যায়। এ জন্য কেউ কোনো ইবাদত সঠিক পদ্ধতিতে আদায়ের পর মনে ওয়াসওয়াসা এলে একে পাত্তা দেয়ার দরকার নেই।ওয়াসওয়াসা শয়তানের ধোঁকার অন্তর্ভুক্ত।

সদ্য দ্বীনে ফেরা সাধারণ ভাই-বোনদের কেউ কেউ শয়তানের ধোঁকায় পড়ে একপর্যায়ে আলেমদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। তারা যে আলেমের মাধ্যমে দ্বীনে ফিরেছেন তাকে ছাড়া অন্যদের তুচ্ছ মনে করতে শুরু করেন। আবার কেউ কেউ দ্বীনে ফেরার কিছুদিন পর শরীয়তের কোনো বিষয়ে মতামত দেয়াও শুরু করেন! এর কারণ হলো, দ্বীনে ফেরার পর প্রথম প্রথম

বেশ কয়েক মাস আমলের প্রতি অন্য সবার তুলনায় অনেক বেশি আগ্রহ-উদ্দীপনা থাকে। তার চারপাশের মানুষের তুলনায় নিজেকে অনেক বেশি ইবাদত করতে দেখে অনেক সময় আত্মবিমুগ্ধতা তৈরি হয়, আর এটা খুবই ভয়ংকর। তখন শয়তান ধোঁকা দেয়,
আমি মনে হয় দ্বীনের ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞ হয়ে গিয়েছি। তখন তার কাছে অন্য সবাইকে তুচ্ছ মনে হতে থাকে। এমনকি আলেমদেরকে তুচ্ছ মনে হয়। তাদের ইলমকে পর্যাপ্ত মনে হয় না। অথচ শরীয়তের কোনো বিষয়ে মতামত দেয়ার জন্য কেবল শরীয়তের ব্যাপারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরই অধিকার রয়েছে। এ ছাড়া অন্যদের
জন্য কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া জায়েয নেই। এমনকি সাধারণ আলেমও ফতোয়ার বিষয়ে অভিজ্ঞ অন্য আলেমের ফতওয়া নকল করবেন, তিনি নিজে থেকে কোনো ফতোয়া দেবেন না।

সাধারণ ব্যক্তিদের দেয়া শয়তানের অন্যতম একটি ধোঁকা হলো, তারা দ্বীনের নিগূঢ় বিষয়সমূহ ও সূক্ষ্ম বিষয়ে গবেষণা শুরু করে দেয়। শরীয়তের এ হুকুমটি কেন হলো, এটা এমন কেন হলো না—এসব নিয়ে ভাবা শুরু করে দেয়। কুরআনের মুতাশাবিহাত বিষয়ে গবেষণা শুরু করে দেয় এবং শরীয়তের বিভিন্ন মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে নিজেরাই মীমাংসা দেয়ার চেষ্টা করতে থাকে। এর ফলে কেউ কেউ বিগড়ে যায়, এমনকি কেউ কেউ দ্বীনহারাও হয়ে যায়। আর শয়তান তো এটাই চাচ্ছিল। সে জানে, স্বাভাবিকভাবে কোনো ব্যক্তিকেই সে সোজা পথে দ্বীন-ঈমানহীন করতে পারবে না। তাই তাদেরকে নেক সুরতে এসব সূক্ষ্ম বিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত করতে থাকে। আর এটাকে তারা সওয়াবের বিষয় মনে করতে থাকে। অথচ সাধারণ ব্যক্তিদের জন্য আবশ্যক হলো, দ্বীনের সূক্ষ্ম ও অমীমাংসিত বিষয়ে গবেষণা করা থেকে বিরত থাকা। কারণ, সে এটার যোগ্যই নয়। এই ধোঁকায় পড়ে কেউ কেউ আলেমদের তুচ্ছ মনে করা শুরু করে দেয়। তখন তারা মনে করে, দ্বীনের এ বিষয়ে আমিই প্রথম গবেষণা শুরু করেছি। আলেমরা আর কীই-বা করছে! যদি কারও মধ্যে এমন ভাবনা থাকে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে শয়তানের বড় ধোঁকায় জড়িয়ে আছে; যা থেকে শীঘ্রই ফিরে আসা আবশ্যক। না হয় এটা তার ঈমানের জন্যও ক্ষতিকর হয়ে যাবে। সাধারণ ব্যক্তিগণ শরীয়তের মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে চুপ থাকবে। নিজস্ব কোনো মত পেশ করবে না। আলেমগণ যা বলেন সেটাই অনুসরণ করবে। এবং দ্বীনের বিষয়ে আলেমদের মতকেই সবচেয়ে সঠিক বলে মনে করবে।

সাধারণ ভাই-বোনদের কেউ কেউ দ্বীনের বিষয়ে গুগল-ইন্টারনেটকেই যথেষ্ট মনে করেন এবং সব বিষয়ে ইন্টারনেটের ওপরেই ভরসা করেন। এটাও শয়তানের একটি ধোঁকা। সে সাধারণ ব্যক্তিদের আলেমদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যই

তাদের এ ধোঁকায় ফেলে। কারণ, আলেমদের থেকে দূরে সরানোর মাধ্যমেই তাদেরকে গোমরাহ করা সহজ। এ জন্য অনলাইন-অফলাইন উভয়ভাবেই আলেমদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে।

শয়তান উলামায়ে কেরামের মাঝের মতবিরোধকে পুঁজি করে, সাধারণ কিছু মানুষের মাঝে হতাশা তৈরি করার চেষ্টা করে। তখন তারা বলতে থাকে,
আলেমরাই যদি এত ঝগড়াঝাটি করে তাহলে আমরা কাদের মানব? আলেমরাই এত দলে বিভক্ত, তাহলে সঠিক ইসলাম কোনটা? এ বলে এটা ঠিক, ও বলে ওটা ঠিক, তাহলে আমরা কাকে মানব? এমন নানা অজুহাত দেখিয়ে তারা
আলেমদের থেকে দূরে সরে পড়েন। এটা শয়তানের মারাত্মক একটি ধোঁকা।

শয়তান কিছু সাধারণ ব্যক্তিকে এই ধোঁকায় ফেলে যে, আমরা সরাসরি কুরআন- হাদীস থেকে শরীয়তের বিধান গ্রহণ করব। ফলে তারা আলেমদের কথাকে অগ্রাহ্য করে। ফিকহ-ফতওয়াকে অস্বীকার করে বসে। এটা তো স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, কোনো সাধারণ ব্যক্তি যেমন মেডিকেলের বইপত্র পড়ে যা বুঝেছে তা দিয়েই চিকিৎসা শুরু করতে পারবে না, তেমনইভাবে একজন সাধারণ ব্যক্তি আলেমের অনুসরণ
ছাড়াই কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী আমল করতে পারবে না। এতে তার গোমরাহ হওয়ার আশঙ্কাই সবচেয়ে বেশি। কারণ, কুরআন ও হাদীসের অর্থ প্রকাশ্য হলেও এর থেকে মাসআলা বের করার যোগ্যতা কেবল শরীয়তের
ব্যাপারে অভিজ্ঞ ও নির্দিষ্ট ব্যক্তিদেরই রয়েছে, যা বহুদিন ইলম অর্জনের পর হাসিল হয়। সুতরাং যারা দ্বীনের জরুরি বিষয়েই এখনো ইলম অর্জন করেননি, কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক অর্থই ঠিকমতো বলতে পারেন না, তাদের জন্য নিজে
নিজে মাসআলা বের করার চেষ্টা করা গোমরাহীরই নামান্তর।

সাধারণ মানুষদের কেউ কেউ নফল, মুস্তাহাবে গুরুত্ব দিলেও ফরজের ক্ষেত্রে অলসতা করেন। অনেক মুসল্লী আজানের পরপরই মসজিদে গিয়ে সামনের কাতারে বসে পড়েন। কিন্তু নামাজে তার খুশু-খুযু থাকে না। নামাজের পর মসজিদ থেকে বের হয়ে আবারও গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েন। কারণ, এই নামাজে তিনি যত্নবান ছিলেন না। তার নামাজে ছিল না খুশু-খুযু। অনেকে পাগড়ি বেঁধে
নামাজ পড়লেও নামাজে তিলাওয়াত শুদ্ধ করার প্রতি কোনো গুরুত্ব দেন না। এ সবকিছুই শয়তানের গুরুতর ধোঁকা। কারণ, তখন মানুষ নিজেকে বুযুর্গ ভাবতে থাকে। ফলে ভুলগুলো

আর চোখে পড়ে না। নামাজের কাতারে আগে গিয়ে বসা যেমন সওয়াবের কাজ, নামাজ খুশু-খুযুর সাথে আদায় করা এর চেয়েও
গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

কিছু সাধারণ মানুষ আল্লাহ তাআলার ক্ষমার আশায় গুনাহের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে পড়ে। শয়তান তাকে ধোঁকা দেয়, যতই গুনাহ করো সমস্যা নেই। তোমার আল্লাহ তাআলা তো বড় দয়ালু। তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন। এমনকি
গুনাহের কাজের শুরুতেও শয়তান এই ধোঁকা দেয়, এখন নাহয় কাজটা করি, পরে তওবা করলেই তো গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন, তিনি তওবাকারী পাপী বান্দাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।
শয়তানের এই ধোঁকায় পড়ে কত মানুষ তওবাবিহীন মৃত্যুবরণ করেছে! তাকে
এমন নিশ্চয়তা কে দিল, গুনাহের পর সে তওবা করার সুযোগ পাবে? যদি সেই গুনাহ করা অবস্থায়ই তার মৃত্যুবরণ হয়ে যায়, তাহলে কী হবে? এ জন্য বান্দার উচিত আল্লাহ তাআলার রহমতের আশা ও আজাবের ভয়—এ দুয়ের
মাঝে অবস্থান করা।

সাধারণ লোকদের কেউ কেউ যুহদ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির শিকার হন। ফলে তারা সবসময় ছেঁড়াফাটা পোশাক পরিধান করেন। কখনো ভালো খাবার খেতে চান না। শুকনো খাবার খান। দিনের পর দিন রোজা রাখেন। রাতভর ইবাদতে মশগুল থাকেন। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা থাকা সত্ত্বেও কিছুই খেতে চান
না। এমনকি কেউ কেউ এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার শ্রেণিকেও তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে থাকেন। তারা ভালো পোশাক পরলে বা গাড়িতে চড়লে, ভালো বাসায় থাকলে, ভালো খাবার খেলে তাদেরকে দুনিয়ালোভী বলতে থাকেন। এটা শয়তানের বড় একটি ধোঁকা। যারা এভাবে যুহদ-তাকওয়ার মাধ্যমে নিজেকে কষ্টে রাখেন, আল্লাহ তাআলার নিয়ামত ভোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রাখেন, তাদের জেনে রাখা উচিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের অভ্যাস এমন ছিল না। তাঁরা ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ যাহিদ, মুত্তাকী; কিন্তু তাঁদের যুহদ ও তাকওয়া যথাযথ ছিল। তাঁরা সামর্থ্য না থাকার কারণে ভালো খাবার খেতে পারতেন না; কিন্তু কখনো পেলে খেতেন না এমনও না। তাঁরাও
রুটি দিয়ে গোশত খেতেন। তাঁরাও সারিদ খেতেন, দুম্বার গোশত খেতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় খাবার ছিল দুধ। তিনি ইয়ামান থেকে হাদিয়াপ্রাপ্ত দামি চাদরও পরতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোশত
খেতেন; রানের গোশত বেশি পছন্দ করতেন।

এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ইবনুল আস রাযি. কে বলেছেন -

فَإِنَّ الحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

'তোমার শরীরেরও তোমার ওপর হক আছে, তোমার চোখেরও তোমার ওপর হক আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার ওপর হক আছে।'(সহীহ বুখারী, ৫১৯৯)

আসবাব-উপকরণ যতটুকু গ্রহণ করা আবশ্যক ততটুকু তো গ্রহণ করতেই হবে। এ জন্যই শরীয়ত যেমন অপচয়ের অনুমতি দেয় না, তেমনইভাবে কার্পণ্যের অনুমতিও দেয় না কোনোভাবেই। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِينَ إِذَا انْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

'তারা যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না; বরং মাঝামাঝি অবস্থানে থাকে।"(সূরা ফুরকান, ৬৭)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার প্রিয় বান্দাগণ অপচয়ও করে না, আবার কার্পণ্যও করে না; বরং তারা প্রয়োজন পরিমাণ খরচ করে।

যুহদ ও তাকওয়ার নামে শয়তান মানুষকে ধোঁকায় ফেলে দেয়। তাই সে বুঝতে পারে না, কতটুকু দুনিয়া গ্রহণ তার জন্য জরুরি। ফলে কেউ কেউ সামর্থ্য থাকার পরেও নোংরা পোশাক পরে নামাজে দাঁড়িয়ে যায়। সামর্থ্য থাকার পরেও ভালো খাবার খায় না। দিনভর খালিপেটে থাকে, দিনের পর দিন রোজা রাখে, রাতভর ইবাদত করে, কদিন পর অসুস্থ হয়ে বিছানাবন্দী হয়ে পড়ে। ফলে তখন ফরজ ইবাদতেই ঘাটতি হয়ে যায়। আর শয়তান তো এটাই চাচ্ছিল; নেক সুরতে ধোঁকা দিয়ে ইবাদতের মাধ্যমেই ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে।
যুহদ ও সাদাসিধা জীবনযাপন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ ঠিকই, তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রকার সুন্নাতের ব্যাপারেব্যাপকভাবে উৎসাহ প্রদান করেননি। কারও পক্ষে যদি আল্লাহর হক ও বান্দার হকে কোনোরূপ ব্যাঘাত ঘটানো ব্যতীত এ প্রকার সুন্নাতের অনুসরণ করা সম্ভব হয়, তাহলে এটা তার জন্য সওয়াব ও সৌভাগ্যের কারণ হবে।
(তাসাওউফ : তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৫)

সাধারণ ব্যক্তিদের ওপর শয়তানের একটি ধোঁকা হলো, শরীয়তের ক্ষেত্রে খাহেশাতের অনুসরণ করা। অর্থাৎ মাসআলার ক্ষেত্রে ওই মতকেই গ্রহণ করা, যা নিজের খাহেশাতের সাথে মিলে যায়।

ইমাম ইবনু হাযম রহ. বলেন, 'একজন ব্যক্তির দ্বীনদারী ও আল্লাহভীতি কম হওয়ার আলামত এটাই যে, সে মাসআলার ক্ষেত্রে এমন মত খোঁজে, যা তার খাহেশ অনুযায়ী হয়।'(আল-ইহকাম ফি উসুলিল আহকাম, ৫/৬৪)

এ-জাতীয় আরও একটি ফিতনা হলো, দ্বীনী বিষয়ে এমন আলেমকে অনুসরণ করা, যার ফতওয়া নিজের মনমতো হয়। স্বাভাবিকভাবে মানুষ সুযোগ-সুবিধাপ্রিয়। যেখানে একটু সুযোগ বেশি পায়, সহজ বেশি হয়, সেখানেই সে ঝুঁকে যায়। তবে দ্বীনের বিষয়ে এমন করা শয়তানের ধোঁকার কারণেই হয়ে থাকে।

এ জন্য উচিত হলো, শরীয়তের প্রকৃত বিধানকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা; মেনে নেয়া। চাই তা নিজের স্বার্থের বিরুদ্ধেই যাক না কেন। চাই তা নিজের সমাজ, পরিবার বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই যাক। মনে রাখবেন, দ্বীনের বিষয়ে প্রকৃত শরীয়তকে

বাদ দিয়ে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা এবং নিজের মনমতো ভুল মাসআলায় আমল করা স্পষ্ট হারাম।

মা-বাবাকে শয়তানের ধোঁকা

সন্তানকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়া মা-বাবার ওপর শয়তানের সবচেয়ে বড় ধোঁকা। মা-বাবা সন্তানের ওপর অগাধ বিশ্বাস রেখে তাকে লাগামহীন ছেড়ে দেন। সন্তানকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেয়া মা-বাবার ওপর সন্তানের হক। যদি মা-বাবা সন্তানকে দ্বীনী ইলম না শেখান, তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে। মূলত প্রত্যেক সন্তানই জন্মের সময় মুসলিম হয়েই জন্মে। এরপর তার মা-বাবাই তাকে হয়তো মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলে, অথবা বেদ্বীন হিসেবে গড়ে তোলে। হাদীসের মধ্যে আছে,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

'প্রতিটি (নবজাতক) শিশুই ইসলামী ফিতরতের ওপরই ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর তার মা-বাবা তাকে ইহুদী বানায়, অথবা খ্রিষ্টান বানায় কিংবা মূর্তিপূজারি বানায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৮৫; সহীহ মুসলিম,২৬৫৮)

শয়তান মা-বাবাকে ধোঁকা দেয়—সন্তানকে দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিলে সে চলবে কী করে? ভালো চাকরি পাবে না, পরিবার চালাতে পারবে না, অনেক কষ্টে দিনযাপন করবে। তাই তারা ভাবেন, সন্তানের ভবিষ্যতের জন্যই তাকে দুনিয়াবি
ইলম শেখাব। কেউ কেউ ভাবেন, সন্তান দ্বীনী ইলম শিখতে গেলে রাষ্ট্র ও সমাজ-বিরোধী হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তখন সে স্বাভাবিক জীবনযাপন থেকে দূরে সরে যাবে। আনন্দ-ফুর্তি ভুলে যাবে। আমাদের বিভিন্ন কাজে বাধা দেবে। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে তারা মনে করেন, এসব আমরা সন্তানের প্রতি দয়াপরবশ হয়েই করছি।
কিন্তু এটা মূলত সন্তানের জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতিকর সিদ্ধান্ত। সন্তানের হক নষ্ট করার সূচনা হয় এর মাধ্যমেই। একজন সন্তানকে দ্বীনের পথে উঠিয়ে দেয়ার চেয়ে উত্তম কোনো কল্যাণকামিতা মা-বাবার জন্য হতেই পারে না। অল্প কয়েক বছরের দুনিয়ার জিন্দেগীতে সাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপনের জন্য না হয় তাকে দ্বীনী ইলম থেকে দূরর রাখা হলো, কিন্তু পরকালের অনন্তকালের জিন্দেগীর কষ্ট থেকে তাকে
বাধানোর কোনো ফিকির করা হয়েছে? এটাই শয়তানের ধোঁকা; অনন্তকালের
কষ্টকে চোখের আড়াল করে দিয়ে ক্ষণস্থায়ী অনিশ্চিত কষ্টকে বড় করে তোলে।
আমি সন্তানকে আলেম বানানো ফরজ তা বলিনি; দ্বীনী ইলম অর্জন করানোর কথা বলেছি, যেটা শৈশব থেকে শেখানো মা-বাবার ওপর ফরজ।

সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা দেয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের আরও একটি ধোঁকা হলো চক্ষুলজ্জা। বংশের সব ছেলে-মেয়েরাই ভার্সিটি-পড়ুয়া, বেশ স্ট্যান্ডার্ড চলাফেরা সবার। এর মধ্যে আমার সন্তান দ্বীনী ইলম শেখার কারণে পাঞ্জাবি-পায়জামা পরবে, মুখে দাড়ি রাখবে, টুপি পরবে, পারিবারিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যাবে না-এতে তো আমার লজ্জায় মুণ্ডু কাটা যাবে। এ কারণেও অনেক বাবা-মা সন্তানকে
দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেন না। অথচ আজকের এই চক্ষুলজ্জা সন্তানের জন্য যে চিরস্থায়ী বিপদ ডেকে আনছে, এর খবর কি তাদের আছে?
সন্তানকে দ্বীনী ইলম শেখা থেকে বিরত রাখা সন্তানের ওপর মা-বাবার সবচেয়ে বড় জুলুম। চাই সেই সন্তানকে যতই আরাম-আয়েশ আর ধনাঢ্যতায় প্রতিপালন করা হোক না কেন, কিয়ামতের দিন এই সন্তানই তাদের বিরুদ্ধে নালিশ নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে দাঁড়িয়ে যাবে। আর সন্তানকে দ্বীনী ইলম শেখানো তার
ওপর বাবা-মায়ের সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ; দুনিয়ার হাজারো কষ্ট-ক্লেশ, অভাব- অনটন যে অনুগ্রহের কাছে একেবারেই তুচ্ছ। কারণ, যে ইলম সন্তানকে শেখানো হয়েছে, তা তাকে আখিরাতে বাদশাহ বানিয়ে দেবে।

অনেক বাবা-মা সন্তানকে দ্বীনী ইলম শেখানোর ক্ষেত্রে হীনম্মন্যতায় ভোগেন। তারা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন। ভবিষ্যতে কী করে খাবে—এই চিন্তা তাদের ব্যাকুল করে তোলে। অথচ আল্লাহ তাআলা বহু আগেই বলে দিয়েছেন,

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

'আর জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহরই। '(সূরা হুদ, ৬)

অনেক বাবা-মা সন্তানকে নামাজের জন্য শাসন করেন না। কারণ, তাদের চোখে সন্তান ১৮-২০ বছর হয়ে গেলেও ছোটই রয়ে গেছে। অথচ হাদীসের মধ্যে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِينَ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، وَإِذَا أَنْكَحَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ، فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ

"যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে, তখন তাদেরকে নামাজ পড়ার নির্দেশ দেবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে, তখন নামাজ না পড়লে এ জন্য তাদেরকে শাসন করবে এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা
পৃথক করে দেবে।'(মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ৬৭৫৬, হাসান)

এটা শয়তানের বড় ধরনের ধোঁকা। সন্তান বড় হয়ে গেলেও যদি নামাজ না পড়ে, শরীয়তের অন্যান্য বিধানগুলো পালন না করে, তাহলে বাবা-মায়ের কঠোর হতে হবে। অনেক সময় সন্তান নামাজ না পড়ার বিভিন্ন অজুহাত দেখাবে। পরীক্ষার সময় সারা রাত পড়ার অজুহাতে ফজরের নামাজ মিস করবে। সন্ধ্যায় পড়ার
চাপের অজুহাতে এশা মিস করতে চাইবে। দুপুরে ঘুমের কারণে আসর মিস করতে চাইবে। তখন বাবা-মায়ের কঠোর হতে হবে। শরীয়তের কোনো বিধানের ব্যাপারে সন্তানকে প্রশ্রয় দেয়া মানে তাকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দেয়া। অনেক
মা-বাবাই এ ব্যাপারটি গুরুত্ব দেন না। মেয়ের বয়স ১৪-১৫ হয়ে গিয়েছে,
শরীয়তের পরিভাষায় সে এখন সাবালিকা। এরপরও ছোট হওয়ার অজুহাতে তাকে পর্দার জন্য চাপ দেয়া হয় না। এখনো তাকে তার কাজিনদের সামনে যেতে দেয়া হয়। গাইরে মাহরাম পুরুষদের সামনে যেতে নিষেধ করা হয় না। এটা শয়তানের ধোঁকা। সাবালিকা হওয়ার আগেই বরং তাকে পর্দা করায় অভ্যস্ত

করে তুলতে হবে। কারণ, মেয়েদের পর্দার বয়স শুরু হয় তার শরীরে মেয়েলি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ হওয়ার সময় থেকেই। পিতা-মাতার কর্তব্য হলো, এমন বয়সি মেয়েদের পর্দার বিষয়ে সচেতন থাকা। গাইরে মাহরামদের সামনে যেতে না দেয়া।

মা-বাবাদের মন স্বাভাবিকভাবে সন্তানের প্রতি নরম হয়ে থাকে। কিন্তু শরীয়তের বিধানের ব্যাপারে এই নম্রতা তাকে ধ্বংস করারই নামান্তর।

বিশেষ করে এই ধোঁকায় বেশি আক্রান্ত হন মায়েরা। তারা সন্তানের অনেক বড় বড় গুনাহ লুকিয়ে রাখেন। সন্তানকে কিছুই বলেন না। এমনকি তার বাবার কাছেও গোপন রাখেন। এই লুকিয়ে রাখার দ্বারা ক্ষণিকের জন্য ভালোবাসা

প্রদর্শন হলেও ভবিষ্যতে সন্তানকে আরও বড় বড় গুনাহের ওপর উদ্বুদ্ধকরণ হয়ে গেল। এবং অনেক সন্তান শুধু এই প্রশ্রয়েই বড় বড় অপরাধ করে থাকে যে, তার মা তো তার পাশে আছেই।

মোটকথা, যেকোনো অজুহাতেই সন্তানকে গুনাহের কাজে প্রশ্রয় দেয়া শয়তানের

ধোঁকা।সন্তানকে গুনাহ থেকে বাঁচানোর চেয়ে বড় অনুগ্রহ আর কিছুই হতে পারে

না। এবং সন্তানকে গুনাহের কাজে প্রশ্রয় দেয়ার চেয়ে বড় ক্ষতি আর কিছুই হতে পারে না। শয়তান ধোঁকা দিয়ে মা-বাবার চোখে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তিকে বড় করে তোলে, আর আখিরাতে অনন্তকালের আজাবের কথা

ভুলিয়ে দেয়। আবার কখনো কখনো এই ধোঁকা দেয় যে, সন্তান বড় হলে ঠিকই নামাজ পড়বে। কিন্তু বড় হলে যখন সন্তান আরও বিগড়ে যায় তখন আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকে না। এ কথা অনস্বীকার্য, সন্তানকে যদি শৈশব থেকেই দ্বীনের পথে না চালানো হয়, শরীয়তের আহকামগুলো মানার প্রতি উদ্বুদ্ধ না করা হয়, সন্তানের দিলে ঈমান-আমল ও তাকওয়ার বীজ বপন না করা হয়, তাহলে এই সন্তান বড় হয়ে অনুগত হবে এই আশা করাই বৃথা; বরং এমন বাবা-মা যেন অপেক্ষায় থাকে, এই সন্তানই কিয়ামতের দিন তাদের টেনে-হিঁচড়ে

জাহান্নামে নেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এখনকার অনেক মা সন্তানকে ভূতের গল্প বা কার্টুন দেখিয়ে শান্ত করেন, খাবার খাওয়ান, ঘুম পাড়ান। এভাবেই মূলত পূর্বেকার বীরপুরুষ আর এ যুগের ভীরুপুরুষদের মাঝে পার্থক্য গড়ে দেয়। কারণ, আগেকার যুগে মায়েরা সন্তানকে

শৈশব থেকেই সাহসের গল্প শোনাতেন। পূর্বপুরুষদের বীরত্বগাথা বিজয়ের গল্প

শুনিয়ে তাদের ছোট্ট মনকেও উদ্বেলিত করতেন। তাদের বোঝাতেন, মুসলমান আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না। অনেক দ্বীনদার মায়েরাও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এ সমস্ত কাজ করে থাকেন। এতে মায়েদের সাময়িক কষ্ট লাঘব হলেও সন্তানকে অভ্যস্ত করা হয় দীর্ঘমেয়াদি

একটি ক্ষতিকর কাজে। সন্তানকে যতটুকু সম্ভব মোবাইলের আলো থেকে দূরে রাখা উত্তম। বিশেষ করে তার সামনে উচ্চ আওয়াজে কোনো কিছু শোনা, তার সামনে কোনো ভিডিও দেখা থেকে বিরত থাকা উচিত। শৈশবে সন্তানদের মন

থাকে মাটির মতো। তখন তাদের যেভাবে গড়ে তোলা হয় তারা সেভাবেই গড়ে ওঠে। তাদের সামনে যে কাজ বারবার করা হয় তারা সে কাজেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এ জন্য সন্তানদের সামনে কোনো গুনাহের কাজ করা একেবারেই উচিত নয়। এতে সন্তান গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়। আজকাল তো অনেক মায়েরা তাদের

সন্তানদের ছোটবেলায় নাচ-গান শেখান। এসব মায়েরা কি তাদের সন্তানদের জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে দেখতে পছন্দ করবেন?

হাদীসের মধ্যে আছে,

كُل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِرَانِهِ، أَوْ يُمَجِسَانِهِ

‘প্রত্যেক শিশু ইসলামী ফিতরতের ওপরই ভূমিষ্ঠ হয়। এরপর তার মা-বাবা তাকে ইহুদী বানায়, অথবা খ্রিষ্টান বানায় কিংবা মূর্তিপূজারি বানায়। (১৭৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৮৫; সহীহ মুসলিম, ২৬৫৮)

অনেক মা-বাবার ওপর শয়তানের বড় একটি ধোঁকা হলো, তারা নিজ সন্তানের জন্য তার কাজিনদের সাথে পর্দা করাকে আবশ্যক মনে করেন না। অথচ এটি শরীয়তের ফরজ একটি বিধান। তারা মনে করেন, এরা তো একে অপরের

ভাই-বোন। আর সবাই তো আমাদের কাছের আত্মীয়ই। তাই ভয় নেই। অথচ কাজিনদের দ্বারা চরিত্র হরণের ঘটনা আমাদের সমাজে কম নয়। এমনকি কাজিন যদি বড় বুযুর্গও হয়, তবুও পর্দার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে ছোট

মেয়েদের ক্ষেত্রে সাবধান থাকা উচিত। আপন খালু, মামা, কাজিন, এমনকি আপন চাচার হাতেও শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা আমাদের সমাজে অহরহ উচিত নয়। সাবালিকা হওয়ার আগে তাদের ওপর পর্দা ফরজ না হলেও এসব

রয়েছে। এ জন্য ছোট মেয়েদের টাইটফিট পোশাক বা অর্ধউলঙ্গ পোশাক পরানো

কারণেই তারা বিভিন্ন সময় নোংরা আক্রমণের শিকার হয় এবং ছোট থেকেই এই পোশাকে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এমনইভাবে ছোট মেয়েদের কোনো পুরুষের সাথে ঘুমাতে দেয়া উচিত নয়। হোক সে আপন চাচা, মামা, খালু বা খুব বড় কোনো কাজিন। শয়তান কখন কাকে ধোঁকা দিয়ে বসে বলা যায় না। কিন্তু আমাদের সমাজে এ ব্যাপারে প্রচুর অবহেলা করা হয়। শয়তান ধোঁকা দেয়, সে তো আমার খুব কাছের লোক, আমাদেরই ঘরের লোক। কিন্তু যখন এই বিশ্বাস ভেঙে যায়, তখন কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

কৈশোরেই সন্তানের হাতে মোবাইল তুলে দেয়ার মতো ভয়ানক কাজ এখন বেশিরভাগ মা-বাবাই করেন। অসংখ্য সন্তান মা-বাবার গাফলতির সুযোগে অনলাইনের ফাঁদে পড়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সমাজে এর উদাহরণ ভূরিভূরি।
মা-বাবা যদি মনে করেন, তাদের সন্তান কখনোই বিপথে যেতে পারেন না, তাহলে নিঃসন্দেহে তারা শয়তানের ধোঁকার মধ্যেই আছেন। এবং সন্তানের
বিপথে যাওয়ার দায়ভার মা-বাবার ওপরেই বর্তাবে।

মা-বাবার উচিত নয় সন্তানের কাছে কোনো গুনাহকে হালকা করে প্রকাশ করা। গুনাহ তো গুনাহ, হোক তা অনেক ছোট; বরং সন্তানকে ছোট গুনাহের ব্যাপারেও শাসন করতে হবে। তা থেকে বিরত রাখতে হবে। সন্তানের বয়সে বাবা-মায়ের থেকে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে কোনো গুনাহ হয়ে থাকলে, অনেক বাবা-মা
সন্তানের ওপর কড়াকড়ি করতে অবহেলা করেন। অথচ আমাদের এ আচরণ আমাদের বাচ্চাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অনেক সন্তান প্রায় সাবালক বা সাবালক হওয়ার পরেও গাইরে মাহরামের সাথে ওঠাবসা, খেলাধুলা ইত্যাদিতে
লিপ্ত থাকে। তাদের মা-বাবা মনে করেন, আমার সন্তান তো এখনো অনেক ছোট। তার তো এখনো গুনাহের বুঝ হয়নি। এটা শয়তানের মারাত্মক একটি ধোঁকা। এর মাধ্যমে ছোট থেকেই সন্তানের মনে গুনাহের ভয়াবহতা কমিয়ে দেয়া হয়। গুনাহের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়। এমনইভাবে সন্তানের সামনে স্বামী-স্ত্রী ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়াও গর্হিত কাজ। এতে শৈশব থেকে সন্তানের মনে ঘৃণা বাসা বাঁধে। ছোট থেকেই সে তার বাবা-
মাকে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত দেখার ফলে তার চিন্তা-চেতনায় মারাত্মক প্রভাব পড়ে। আর সন্তান বদমেজাজি হওয়ার পেছনে মা-বাবারও অনেক বড় অবদান থাকে। সন্তান যদি শৈশব থেকেই পরিবারে ধৈর্য ও সবরের শিক্ষা পেত, তাহলে
বড় হয়ে সেও সবর করত। সন্তান যদি শৈশবেই দেখত, মা-বাবার মাঝে কী অপার মিল, তাহলে এই সন্তানও বড় হয়ে মা-বাবার সাথে ভালো আচরণ করত।

মোটকথা, শৈশবে সন্তান মা-বাবার কাছ থেকে যে আচরণ দেখে, বড় হয়ে সেটাই সে নিজের মধ্যে ধারণ করে।

সন্তানকে দরিদ্রতা বোঝানোর জন্য সামর্থ্য থাকার পরও অত্যন্ত কষ্টে রাখা অথবা আরাম-আয়েশে প্রতিপালনের জন্য প্রচুর অপব্যয় করা—দুটোই শয়তানের ধোঁকা। বরং সন্তানকে শেখাতে হবে, দরিদ্রতায় কীভাবে সবর করতে হয়, অল্পে তুষ্ট থাকতে হয়। আর ধনাঢ্যতায়

শেখাতে হবে পরিমিত ব্যয়ের শিক্ষা, দরিদ্রদের দু-হাত ভরে দান করার শিক্ষা এবং প্রচুর সম্পদ থাকার পরও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তিরقُتِلَتۡ

স্বামী -স্ত্রীকে শয়তানের ধোকা

কোনো কোনো স্বামী-স্ত্রী ফরজ গোসলের ক্ষেত্রে শয়তানের মারাত্মক ধোঁকায় পড়েন। ফলে কখনো তারা ফজরের নামাজ ছেড়ে দেন। আমরা পূর্বেও এ বিষয়ে আলোচনা করেছি, চক্ষুলজ্জার চেয়ে আল্লাহ তাআলার আজাবের ভয় দিলে বেশি
থাকা উচিত। ফরজ গোসল কোনো গোপন বিষয় নয় যে, এটা কেবল তারাই প্রথম করছে। সুতরাং গোসল ফরজ হলে গোসল করে নিতে হবে। এ ক্ষেত্রে লজ্জাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া থেকে বাঁচতে আগে আগে গোসল সেরে নেয়া যেতে পারে।

স্বামী-স্ত্রীর ওপর শয়তানের একটি মারাত্মক ধোঁকা হলো, জন্মনিয়ন্ত্রণ বা গর্ভপাত।
অনেক নারী মনে করেন, নিজের শরীরের ফিটনেস ধরে রাখার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ
বা গর্ভপাত করা যায়। এটা শয়তানের ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয়। গর্ভ থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভিন্ন উপায়ে গর্ভপাত ঘটানোকে এবোরশন
(Abortion) বলে। এটি জন্মনিয়ন্ত্রণের বহু পুরাতন একটি পদ্ধতি। জন্মনিয়ন্ত্রণের (Contraceptives) উপায়-উপাদানের অনেক উন্নতি সত্ত্বেও আজ অবধি দুনিয়ার বিভিন্ন স্থানে এ পদ্ধতি চালু আছে। এ পদ্ধতি নাজায়েয।

এ ব্যাধি সম্পর্কে বিস্তারিত :
গর্ভস্থ সন্তানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হোক বা না হোক মায়ের মৃত্যু বা শারীরিক মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কা ছাড়া গর্ভ নষ্ট করে ফেলা নাজায়েয। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হয়ে গেলে এবং রূহ সঞ্চার হওয়ার পর হলে তা নষ্ট কর ফেলা আরও বড় গুনাহ এবং মানুষ হত্যার শামিল। আধুনিক যুগে ভ্রূণহত্যা জাহেলি যুগে কন্যাসন্তানকে জীবন্ত সমাধিস্থ করার নামান্তর। তখন বাবা নিজ মেয়েকে গর্তে পুঁতে ফেলত, আর এখন আধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা মায়ের পেটেই শিশুকে মেরে ফেলা হয়। এ দুই হত্যার মধ্যে বাহ্যত কোনো তফাত নেই। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَإِذَا الْمَوْءِ دَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتۡ

‘স্মরণ করো ওই দিনকে, যেদিন জীবন্ত সমাধিস্থ নিষ্পাপ বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাকে কোন অপরাধের কারণে হত্যা করা হয়েছে?' (সূরা তাকভীর: ৮, ৯)

শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেকেই মনে করেন, আগত শিশুকে লালনপালন করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। এই ভয়ে ভ্রূণ মেরে ফেলেন। এ কাজটি নিতান্তই নিন্দনীয় ও বোকামি। কেননা, যিনি তার বান্দাকে এত যত্ন করে সৃষ্টি করেছেন,তিনি তার রিজিকেরও ব্যবস্থা করবেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا

‘অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কোরো না। আমিই তাদের রিজিক দিই এবং তোমাদেরও দিই। নিশ্চয় তাদের
হত্যা করা মহাপাপ।(সূরা ইসরা,৩১)

ক. নবদম্পতিদের শয়তানের ধোঁকা

কোনো কোনো নবদম্পতি বাচ্চা নষ্ট করেন এ কারণে যে, নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে,বাচ্চা-কাচ্চার ঝামেলা সামলাতে পারবে না। কয়েক বছর স্বামী-স্ত্রী একটু এনজয় করবে—এমন চিন্তা-ভাবনা থেকে গর্ভের বাচ্চা নষ্ট করেন। মনে
রাখবেন, এটা অনেক কঠিন একটি গুনাহ। মায়ের গর্ভে সন্তানের আগমন অনেক বড় একটি নিয়ামত, যা আল্লাহ তাআলার বিশেষ দানও বটে। আর কেউ আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে নষ্ট করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, সে আল্লাহ তাআলার
নিয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করল। শরীয়ত-সমর্থিত কোনো কারণ, যেমন অসুস্থতা বা অন্য কোনো ওজর ব্যতীত সন্তান আগমনে বাধা সৃষ্টি করা মূলত আল্লাহ তাআলার স্বাভাবিক সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় বাধা দেয়ারই নামান্তর। সুতরাং বাচ্চা বেশি হলে খাওয়াতে পারবে না এ ধরনের অমূলক আশঙ্কায় যদি সন্তান গর্ভে আসার পর নষ্ট করে—চাই তা এক দিনের হোক—বিলকুল
জায়েয নেই।

খ. জন্মনিয়ন্ত্রণের বিধান

সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হয় :

১. স্থায়ী পদ্ধতি। যার দ্বারা নারী বা পুরুষ প্রজনন ক্ষমতা স্থায়ীভাবে হারিয়ে ফেলে। এ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ অবৈধ। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ উমদাতুল কারীতে উল্লেখ করেন,

وَهُوَ مُحَرَّمٌ بالاتِّفَاقِ

অর্থাৎ, স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। (উমদাতুল কারী, ২০/৭২, বক্তব্যটি ইমাম কুরতুবী রহ.-এর)[৩]

২. অস্থায়ী পদ্ধতি। যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর কেউ প্রজনন ক্ষমতাহীন হয়ে যায় না। যেমন আযল করা, Condom Jelly, Cream, Foam, Douche ইত্যাদি ব্যবহার করা, পিল (Pill) খাওয়া, জরায়ুর মুখ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেয়া,ইঞ্জেকশন নেয়া ইত্যাদি। এ পদ্ধতি কেবল নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে বৈধ হবে:

- দুই বাচ্চার জন্মের মাঝে কিছু সময় বিরতি দেয়া, যাতে প্রথম সন্তানের লালনপালন, পরিচর্যা ঠিকমতো হয়।

- কোনো কারণে মহিলার বাচ্চা লালনপালনের সামর্থ্য না থাকলে।
- মহিলা অত্যধিক অসুস্থ ও দুর্বল হওয়ার কারণে গর্ভধারণ বিপজ্জনক হলে।

হাদীসের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم. َ

'হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আযল (যা জন্মনিয়ন্ত্রণের একটা পুরোনো ও অস্থায়ী পদ্ধতি) করতাম।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫২০৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৪)

উক্ত আলোচনা থেকে আশা করি এটা পরিষ্কার হয়েছে যে, ইসলাম জন্মনিয়ন্ত্রণের সকল পদ্ধতি নয়; বরং বিশেষ পদ্ধতির এবং সাধারণ অবস্থাতে নয়, বরং বিশেষ অবস্থাতে এর অনুমোদন দেয়।

অন্যথায় সাধারণ অবস্থায় ইসলাম মানুষকে অধিক সন্তানলাভের প্রতি উৎসাহ দিয়েছে এবং যেসব নারী অধিক সন্তানের প্রসবী হয়ে থাকে, তাদের বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

تزَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"তোমরা অধিক সন্তান প্রসবী এবং স্বামীদের অধিক ভালোবাসে—এ ধরনের মেয়েদের বিবাহ করো। কারণ, কিয়ামতের দিন আমি আমার উম্মত বেশি হওয়ার কারণে আল্লাহর দরবারে গর্ব করব।'(মুসনাদু বাযযার, হাদীস নং ৬৪৫৬; মুসনাদু আহমাদ, হাদীস নং ১২৬১৩, ১৩৫৬৯; সুনানু আবি দাউদ, ২০50, সহীহ)[৩]

স্বামীর অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা এখন যেন স্বাভাবিক বিষয় হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে কোনো কোনো স্ত্রী তার পরিবারের কারও প্ররোচনায় স্বামীর অবাধ্যতা করেন। আবু উমামা আল-বাহেলী রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَاتهمُ العَبْدُ الآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ، وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا

سَاخِطٌ ، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُون. َ

'তিন ব্যক্তি এমন, যাদের সালাত তাদের কানও অতিক্রম করে না, অর্থাৎ কবুল হয় না। ১. পলাতক গোলাম, যতক্ষণ না সে (মালিকের কাছে) ফিরে আসে ততক্ষণ তার নামাজ কবুল হয় না। ২. এমন মহিলা, যে তার স্বামীর অসন্তুষ্টিতে রাত্রি যাপন করে। ৩. এমন ইমাম, মুসল্লীরা যাকে অপছন্দ করে। (জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ৩৬০, হাসান)

কোনো কোনো নারী মনে করেন, যেকোনো বিষয়ে স্বামীর বিপরীতে অবাধে মত প্রকাশ ও স্বামীর মতামত অমান্য করার অবাধ স্বাধীনতা রয়েছে তার। ফলত তারা মনে করেন, স্বামী যা বলবে (শরয়ী-সমর্থিত) তা-ই মানা তাদের জন্য জরুরি না। এটা মূলত শয়তানের ধোঁকা। স্বামী যদি শরীয়ত-বিরোধী কোনো আদেশ না দেয়,
তাহলে তা মানা স্ত্রীর জন্য আবশ্যক।

কোনো কোনো নারী শরয়ী কোনো ওজর ছাড়াই স্বামী-সঙ্গ দিতে চান না। তারা স্বামীকে শারীরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখেন। হাদীসের ভাষায় এমন নারী নিকৃষ্ট ও অভিশপ্ত। আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى

"কোনো লোক যদি স্ত্রীকে বিছানায় আসতে ডাকে, আর সে অস্বীকার করে এবং সে ব্যক্তি স্ত্রীর ওপর দুঃখ নিয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে ফেরেশতাগণ এমন স্ত্রীর ওপর সকাল পর্যন্ত লানত দিতে থাকে।
(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৩৬)

কোনো কোনো নারীর অভ্যাস হলো, নিজ স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির দোষগুলো অপরের কাছে বলে বেড়ানো। আশেপাশের মহিলারা তার কাছে এলেই জমে যায় গীবতের মজলিস। এ সমস্যা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে স্ত্রী যখন তার
কাজিনদের কাছে পায়। হাজারো সুখ-দুঃখের ঝাঁপি খুলে বসে তখন। এতে প্রথম গুনাহ হয় গীবতের। দ্বিতীয় গুনাহ হয় স্বামীর আমানতের খিয়ানতের। কারণ, স্বামীর বা স্বামীর পরিবারের সবকিছুই স্ত্রীর কাছে আমানত থাকে।
নারীদের জন্য উচিত হলো, তারা কারও কাছে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির দোষত্রুটি বলবে না; এটা তার কর্তব্য। তা ছাড়া এটা তো তার চক্ষুলজ্জারও বিষয়। কারণ, স্বামীর পরিবার মানে তো তারই পরিবার। আর নিজের পরিবারের দোষের কথা

সবার কাছে বলে বেড়ানো ভদ্রতার ভেতর পড়ে না।

এমনইভাবে স্বামীর জন্যও জরুরি হলো, স্ত্রীর ছবি-ভিডিও বন্ধু-বান্ধব বা অন্য কাউকে কোনোভাবেই না দেখানো। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নিজের স্ত্রী বা শ্বশুরবাড়ির দোষচর্চা না করা। বন্ধু-বান্ধব একসাথে হলে যেন গীবতের
পসরা খুলে যায়। কে কত গীবত-শেকায়াত, এমনকি অপবাদ দিতে পারে এর প্রতিযোগিতা লেগে যায়। এমন আড্ডার মজলিসগুলোই কিয়ামতের দিন আফসোসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সামান্য সময়ের এমন গীবতের মজলিসই যখন
নিজের অসংখ্য নেকী মুহূর্তেই ধ্বংস করে দেবে, তখন তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করা যাবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

‘তারা তোমাদের পোশাকস্বরূপ এবং তোমরাও তাদের পোশাকস্বরূপ। (সুরা বাকারা,১৮৭)

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য পোশাকের মতো। পোশাক যেমন আমাদের ভেতরের অবয়বকে লুকিয়ে রাখে, ভেতরে কোনো ত্রুটি থাকলে তা অগোচরে রাখে, স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের দোষকে এভাবে লুকিয়ে রাখবে। সব সমস্যায় একে অপরকে এভাবে আগলে রাখবে। একটি মধুর সম্পর্কে ফাটল তখনই ধরে, যখন তাদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো নিজেরাই ফাঁস করতে থাকে। কারণ, এতে নিজেদের মধ্যে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। আর শয়তান তো এটাই চায়। তাই সে এতদিন ধোঁকার মাধ্যমে একে অপরকে দিয়ে গোপনীয়তা ভেঙে দিয়েছে। তাদের মাথায় এতদিন দিয়ে রেখেছে, এটা তো গীবত না; এটা সুখ-দুঃখের শেয়ার মাত্র! এটা না করলে তো মন ভার হয়ে থাকবে। নিজের দুঃখের কথা আরেকজনকে বললে তো মন হালকা হবে। এভাবে মন হালকা করতে গিয়ে কত সম্পর্ক যে
হালকা হয়ে গেল এর হিসাব কে রাখে!

স্বামী-স্ত্রীকে শয়তান ধোঁকা দিয়ে সবচেয়ে বড় যে ক্ষতিটি করে তা হলো, বিবাহ-বিচ্ছেদ। ঠুনকো অজুহাত দাঁড় করিয়ে শয়তান তাদের মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি করে দেয়। একটি সংসারে ভাঙন মানে হাজারো সমস্যার শুরু। অথচ আজকাল তুচ্ছ কারণেও বিচ্ছেদকে বেছে নেয়া হয়। সংসার ভাঙা যেন আজ মাটির পাত্র ভাঙার মতো সহজ কাজ হয়ে গিয়েছে।আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী বর্ণিত হয়েছে যে,

أَبْغَضُ الحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ.

'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হালাল হচ্ছে তালাক।'(সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ২১ ৭৮;সুনানে ইবনে মাজাহ ২০১৮, বর্ণনা যোগ্য)

কাজেই তালাকের ব্যাপারে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। নারী-পুরুষ উভয়ের কর্তব্য
তাই পুরুষকে তালাক থেকে দূরে থাকা। তালাক দেয়ার ক্ষমতা যেহেতু পুরুষের, এই ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে খুবই সংযমী হতে হবে।
শয়তানের ধোঁকায় পড়ে অনেক নারী স্বামীর কাছে তালাক চেয়ে বসেন। এর পেছনে বেশি আশকারা দেয় তার বন্ধু-বান্ধব; কিছু ক্ষেত্রে পরিবারও আশকারা দিয়ে থাকে। অথচ এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

'যে নারী তার স্বামীর কাছে বিনা কারণে তালাক প্রার্থনা করে, তার জন্য জান্নাতের সুঘ্রাণ পর্যন্ত হারাম।'(সুনানে আবু দাউদ, ২২২৬; জামে' তিরমিযী, ১১৮৭, হাসান)

সম্প্রতি পরকীয়ার যে বিস্তার, এতে যেমন পুরুষের অপরাধ আছে, তেমনই আছে নারীরও। দেখা যাচ্ছে যে, এক নারীর দ্বারাই অন্য নারীর সংসার ভাঙছে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী খুবই
প্রাসঙ্গিক। জামে তিরমিযীতে হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لَا تَسْأَلِ المرأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا.

'কোনো নারী যেন তার বোনের (অপর নারীর) হিস্যা নিজের পাত্রে উপুড় করে নেয়ার জন্য তালাকের ফরমায়েশ না করে।"
(সহীহ বুখারী, ২১৪০; সহীহ মুসলিম, ১৪০৮)

প্রত্যেকের কর্তব্য, নিজের পাতে যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকা। অন্যের পাতে যা আছে তা-ও নিজের পাতে নিয়ে নেয়ার মতো লোভী মানসিকতা কোনো ভদ্র মানুষের হতে পারে না।

উপরন্তু যখন ওই নারীটিও একজন নারী, একজন মুসলিম, দ্বীনী বোন। তো এই সকল ঈমানী ও মানবীয় চেতনার বিস্তার এখন খুবই জরুরি। তাহলে
অন্যায়-অযৌক্তিক কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের হার অনেক হ্রাস পাবে। নারী-পুরুষ উভয়ে যদি পরিপূর্ণভাবে পর্দার বিধান মেনে চলে, তবে পরকীয়া জাতীয় কিছু ঘটার আশঙ্কা থাকবে না।

বিয়ের আগে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো,
বিয়ে ও বিয়ে-পরবর্তী বিভিন্ন বিষয়ে মাসাআলা-মাসায়েল জেনে নেয়া।বিয়ের আগের বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েল, কীভাবে সুন্নাহ অনুসারে বিয়ে করা যাবে, বিয়েতে কী কী কাজ শরীয়ত সমর্থন করে না ইত্যাদি বিষয় তো জানতেই হবে।
হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

'ইলম অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ। (ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ২২৪, সহীহ)

এই হাদীসে আলেম বা মুফতী হওয়াকে ফরজ বলা হয়নি। শরীয়তের বিধান হলো, প্রত্যেক অঞ্চলে কমপক্ষে একজন আলেম থাকা ফরজে কিফায়া, যাতে তিনি ওই অঞ্চলের মানুষদের শরয়ী সমস্যার সামাধান দিতে পারেন। তবে মানুষ
যখন যে অবস্থার সম্মুখীন হয়, সে অবস্থার ইলম অর্জন করা তার জন্য ফরজ। যেমন : কেউ বিয়ে করতে চাইলে বিয়ের পূর্বেই তার এ-সংক্রান্ত যাবতীয় মাসআলা-মাসায়েল জেনে নেয়া আবশ্যক।
এর মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হচ্ছে, তালাক-সংক্রান্ত মাসায়েল। ঈমান-বিষয়ক আলোচনার পর মানুষ সবচেয়ে গাফেল সম্ভবত তালাক-সংক্রান্ত বিষয়ে। যারা এ-সংক্রান্ত মাসআলা-মাসায়েল পড়েছেন। তারা ব্যতীত সাধারণ লোকদের ৯০%-এরও বেশি মানুষ তালাকের ব্যাপারে কিছুই জানে না। কী কী কথার কারণে তালাক হয়ে যাবে, মানুষ এটাই জানে না। ফলে তালাক হয়ে যাওয়ার পরও বহু বছর যাবৎ তারা সংসার করছে, সন্তানাদিও হচ্ছে। ফলে এসব সন্তান শরয়ী বিধান অনুযায়ী পিতৃপরিচয়হীন বড় হচ্ছে। এ অবস্থায় যতদিন
স্বামী-স্ত্রী একসাথে বসবাস করবে ততদিন তাদের যিনার গুনাহ হতে থাকবে। কোনো স্বামীই চায় না তার প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে তার বিচ্ছেদ হয়ে যাক। কিন্তু খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য হওয়া স্বাভাবিক; আর তখনই শয়তান দুজনের
মাঝে খুব বড় একটি কাজ করে বসে, তা হলো, স্বামীর মুখ থেকে সে এমন কথা বের করে বসে, যার দ্বারা স্ত্রী তালাক হয়ে যায়। অথচ স্বামী ঘুণাক্ষরেও টের পেল না। কেউ কেউ তো স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে মাসআলা না জানার কারণে পুনরায় বিয়ে করে সংসার করতে থাকে!

বেশিরভাগ লোক মনে করেন, তালাক যদি রাগের মাথায় দেয়া হয় তাহলে তালাক হয় না। এটা বুঝে তারা দিব্যি সংসার করতে থাকেন। অথচ এটা তো স্পষ্ট বিষয় যে, তালাক কেউ হাসিখুশি অবস্থায় দেয় না।বরং তালাক তো দেয়াই হয় ঝগড়া অবস্থায় রাগের মাথায়।

বিয়ে, তালাক আর গোলাম আযাদ—এ তিনটি বিষয় মুখ থেকে বের হয়ে গেলেই আর কখনো ফিরিয়ে নেয়া যায় না। কেউ যদি বিয়ের সব শর্ত-সহ অভিনয় বা ঠাট্টা করতে করতে ইজাব-কবুল করে ফেলে, তাহলে তার বিয়ে হয়ে যাবে। এমনইভাবে কেউ যদি স্ত্রীকে তালাকের কোনো শব্দ বলে ফেলে, চাই সেটা রাগের মাথায় হোক বা ঠান্ডা মাথায়, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, তালাক হয়ে যাবে।

প্রস্রাব পায়খানার ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

কিছু লোক প্রস্রাব পায়খানায় অনর্থক দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকে । এটা হার্টের জন্য ক্ষতিকর। আবার কিছু লোক প্রস্রাব করার পর প্রস্রাব উত্তমরূপে নিষ্কাশনের জন্য উঠা বসা করে। (হ্যাঁ, কারো মুত্রাশয় যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, যার ফলে প্রস্রাব ধীরে ধীরে নিষ্কাশিত হয় এবং ফোঁটা ফোঁটা বের হয় তাহলে তার ব্যাপার ভিন্ন।) কেউ কেউ এস্তেঞ্জা করতে গিয়ে অধিক পানি খরচ করে ফেলে। অথচ নাপাকি দূর করার ব্যাপারে যারা কঠোর মতপোষণ করেন তারাও উর্ধ্বে সাতবার ধৌত করার কথা বলেন। বিনা প্রয়োজনে অধিক পরিমাণ খরচ করা সমীচীন নয়। হাদীসে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। ইরশাদ করলেন , এই দুজনের কবরের আজাব হচ্ছে। একজনের চোগলখোরীর কারণে আর অপর জনের প্রস্রাবের ব্যাপারে অসাবধানতার কারণে। অর্থাৎ শরীরকে প্রস্রাবের ছিটা হতে বাঁচাতো না।

আমাদের মধ্যে এমন কিছু ভদ্রলোক আছেন যারা ইস্তেঞ্জা অর্থাৎ প্রস্রাব হতে পবিত্রতা হাসিলের ব্যাপারটিকে জরুরী মনে করেন না এবং এটা নিয়ে অনেক সময় হাসি-ঠাট্টাও করেন। উলামায়ে কেরাম প্রস্রাব হতে পবিত্রতা হাসিল না করাকে কবীরা গুনাহ বলেছেন। ইবনে হজর মক্কী (রহঃ) বলেণ, বেশীর ভাগ কবরের আজাব প্রস্রাব হতে অবিত্রতার কারনে হয়ে থাকে । এক হাদীসে আছে, কবরের মধ্যে সর্ব প্রথম প্রস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। সুতরাং কবরের আজাব অত্যন্ত শক্ত ব্যাপার ।

অযুর ব্যাপারে শয়তানের ধোঁকা

কিছু জাহেল আবেদ অযু করার সময় বিভিন্ন ধরনের নিয়ত মুখে উচ্চারণ করে এবং বার বার উচ্চারণ করে। যেমন বলে, আমি নাপাক দূর করার জন্য অযু করছি। নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অযু করছি। আর এটা বার বার বলে । অথচ নিয়ত হচ্ছে অন্তরের ইচ্ছার নাম। আর মুখে যদি কেউ উচ্চারণ করতে চায় তবে একবার উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট। বার বার উচ্চারণ করার কোন প্রয়োজন নেই। আবার কখনও পানির ব্যাপারে শয়তান ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে যে, যে পানি দিয়ে অযু করছ সেটা কোথা হতে আনা হয়েছে? পাক জায়গা হতে নাকি নাপাক জায়গা হতে? পানি আবৃত ছিল নাকি অনাবৃত ছিল। অনাবৃত থাকলে পাখি হয়ত তাতে পায়খানা করে রেখেছে। এ ধরনের বিভিন্ন সন্দেহের সৃষ্টি করে ।

কিছু লোক অযু গোসলে অধিক পানি খরচ করে। এতে চারটি অসুবিধা ও মাকরূহ বিষয় রয়েছে। যথা-

১. পানির অপচয়

২. সময়ের অপচয়

৩.শরীয়তের নির্দেশকে উপেক্ষা করা। কেননা শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে অল্প পানি খরচ করা।

৪. শরীয়ত তিনবারের অধিক ধৌত করাকে জুলুম বা সীমা লঙ্ঘন বলে আখ্যায়িত করেছে। অধিক পানি খরচ করে নিজের উপর জুলুম করা হচ্ছে এবং সীমা লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

কেউ কেউ অযুতে এত সময় কাটায় যে, নামাযের ওয়াক্ত চলে যায় অথবা প্রথম ওয়াক্তের ফযীলত থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। শয়তান এসে ওয়াসওয়াসা দেয় যে, অযুতে সাবধানতা অবলম্বন করা চাই। কারণ অযু শুদ্ধ না হলে নামাযই শুদ্ধ হবে না। কিন্তু এ আবেদ বুঝতে পারছে না যে, এটা মূলতঃ সাবধানতা নয়; বরং ধোঁকা ও ওয়াসওয়াসা। কারণ যদি সাবধান হত তবে সে হারাম খাবার, গীবত ইত্যাদি বিষয় থেকেও সাবধানতা অবলম্বন করত । অথচ দেখা যায় যে, সে এসব নাজায়েয বিষয়ে লিপ্ত রয়েছে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ (রাঃ)-এর নিকট দিয়ে গমন

করছিলেন। সাদ (রাঃ) তখন অযু করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ওহে সাদ! এটা কেমন অপচয়? সাদ (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অযুর কাজে পানি ব্যবহার করলেও কি অপচয় গণ্য হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যদিও তুমি প্রবাহমান নদীর তীরে বসে অযু কর।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, অযুতে ওয়াসওয়াসা দেয়ার জন্য একটি শয়তান নিযুক্ত রয়েছে। তাকে ওয়ালাহান বলা হয়। অতএব তোমরা পানির ব্যাপারে তার ওয়াসওয়াসা থেকে বেঁচে থাক ।

আযানের ক্ষেত্রে শয়তানের ধোঁকা

কোন কোন মুয়াযযিন আযান দিতে গিয়ে গানের সুরে আযান দেয় । ইমাম মালেক (রহঃ) ও আরো অনেক আলেমের মতে এটা কঠোর মাকরূহ । এরূপ করা আযানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার শামিল। কেউ কেউ ফজরের আযানের পূর্বে উচ্চস্বরে কেরাত তাসবিহ ইত্যাদি পড়তে থাকে এতে কারো ঘুম ব্যাহত হয়, কারো তাহাজ্জুদের নামাজ ব্যাহত হয়।

উপসংহার

নফস ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষ অনেক গুনাহ করে থাকে। তবে শয়তানের কিছু ধোঁকা থাকে ভিন্নরকম। সে মানুষের সামনে নেক একটা আবরণ দিয়ে গুনাহকে উপস্থাপন করে। এতে মানুষ ধোঁকাগ্রস্ত হয় এবং গুনাহে জড়িয়ে পড়ে। শয়তানের নেক সুরতের নানামুখী ধোকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতেই এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এই গবেষণায় সাধারণত গতানুগতিক গুনাহের কথা উল্লেখ করা হয়নি; বরং যে সব গুনাহের কাজ ভালো মনে করে করা হয় সেগুলি সাধারণত তুলে ধরা হয়েছে। কারণ এটা শয়তানের মারাত্মক ধোকা যে, গুনাহের কাজকে গুনাহ মনে না করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সব ক্ষেত্রে শয়তানের ধোকা থেকে হেফাজত করুন। ইবাদত গুলো শয়তানের ধোঁকা থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

প্রাসঙ্গিক উৎস

[১]শয়তান তোমার শত্রু, শাইখ খালিদ আর রশিদ

[২]তালবিসে ইবলিশ শয়তানের ধোঁকা,ইমাম ইবনুল জাওযী (রহঃ)

[৩]নেক সুরতে শয়তানের ধোঁকা, মাওলানা তান